বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া

ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া

ড. অর্থদর্শী বড়ুয়া

অশোক কুমার চাকমা

বরুণ তালুকদার

মার্জিয়া খাতান স্মিতা

এ এফ এম সারোয়ার জাহান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

সুবীর মন্ডল

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

কে. এম. ইউসুফ আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী

নাম _____

বিদ্যালয় _____

তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। এই বইয়ের মাধ্যমে তুমি বেশ কিছু সুন্দর ও মজার অভিজ্ঞতা পাবে। অভিজ্ঞতা পাওয়ার সময় কখনো বন্ধু, কখনো বাবা-মা, কখনো পরিবারের সদস্য, কখনো সহপাঠী বা শিক্ষক তোমার সহযোগী হবেন। কখনো একা একাও অভিজ্ঞতাগুলো লাভ করবে। তখন এই বই হবে তোমার একমাত্র বন্ধু।

তুমি যে অভিজ্ঞতা পাবে এবং যা জানবে, তা এই বইয়ে লিখে রাখতে ভুলবে না কিন্তু! তা হলেই এই বই হতে পারে তোমার তৈরি রিসোর্স বই।

শুভ কামনা রইল।

সূচিপত্র

বুদ্ধের জীবনকথা	১ - ১৭
বিনয় পিটক	১৮ - ২৮
বন্দনা	২৯ - ৩৯
ধর্মীয় উৎসব: কঠিন চীবর দান	৪০ - ৪৯
সূত্র ও নীতিগাথা	৫০ - ৬৮
জাতক, চরিতমালা ও উপাখ্যান	৬৯ - ৯০
বৌদ্ধধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা	৯১ - ৯৮
শব্দকোষ	৯৯

বুদ্ধের জীবনকথা

এই অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারব–

১. সিদ্ধার্থের বংশ পরিচয় ও জন্মবৃত্তান্ত;
২. বাল্যজীবন ও চার নিমিত্ত দর্শন;
৩. গৃহত্যাগ
৪. বুদ্ধত্ব লাভ ও ধর্ম প্রচার;
৫. মহাপরিনির্বাণ।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১

আজকে আমরা একটি ভিডিও চিত্র দেখব।

তোমরা বাসায় গিয়েও নিচের কিউআর কোড স্ক্যান করে নিচের ওয়েবসাইট থেকে এই ভিডিওটি দেখতে পারবে। স্ক্যান করার সময় প্রয়োজনে পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো।

QR Code-

বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তোমরা আরও অনেক ভিডিও পেয়ে যাবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২

ভিডিও চিত্রটিতে ভগবান বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কে নতুন কী কী তথ্য জেনেছ, যা তোমার আগে জানা ছিল না, সে সম্পর্কে লেখো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

তোমরা ইতোমধ্যে বুদ্ধ সম্পর্কে জেনেছ। আগের শ্রেণিতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বুদ্ধের জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করা হলো। 'বুদ্ধ' শব্দে অনন্ত জ্ঞান ও গুণের সমষ্টি বোঝায়। সে জ্ঞান ও গুণ বহুমাত্রিক; মানবের ইহকাল ও পরকাল বিষয়ে সামগ্রিক জ্ঞান। অমিত গুণসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি 'বুদ্ধ' হিসেবে জন্মগ্রহণ করেননি। বুদ্ধত্ব তাঁকে অর্জন করতে হয়েছিল। তাঁর জন্ম হয়েছিল প্রাচীন ভারতের কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজপুত্র হিসেবে। এই রাজপুত্রই আপন অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা ও অপরিসীম ত্যাগতিতিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধত্বে উপনীত হয়েছিলেন। সে জন্য বলা হয়–সিদ্ধার্থ থেকে বুদ্ধ এক মহাজীবনের ইতিহাস।

সিদ্ধার্থের বংশ পরিচয়

অনেক বছর আগের কথা। খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে হিমালয়ের পাদদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে ক্ষত্রিয়দের একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের নাম ছিল কপিলাবস্তু। রাজ্যের রাজা ছিলেন শাক্যবংশীয়। নাম শুদ্ধোদন। রানির নাম মহামায়াদেবী বা মায়াদেবী। তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। বহু সাধনার পর তাঁদের একটি সন্তানের জন্ম হয়। সেই শিশুপুত্রের নাম রাখা হয় কুমার সিদ্ধার্থ। এছাড়া শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করার কারণে শাক্যসিংহ নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কুমার সিদ্ধার্থের মামার বাড়ি ছিল কপিলাবস্তুর পাশের অঞ্চল দেবদহে। মায়াদেবী পিত্রালয়ে যাওয়ার পথে লুম্বিনী কাননে কুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয়। কপিলাবস্তু থেকে কয়েক মাইল দূরে লুম্বিনী কানন।

বর্তমান বিশ্বের ভৌগোলিক পরিচয়ে লুম্বিনী নেপালের অন্তর্গত। এটি বৌদ্ধদের স্বীকৃত চার মহাতীর্থ স্থানের একটি। কুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের ঐতিহাসিক স্মৃতির কারণে লুম্বিনী বিশ্ববৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত স্মরণীয় ও আকর্ষণীয় স্থান। পর্যটকদের এ স্থানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। লুম্বিনীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ বিহার আছে। বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগেও লুম্বিনীতে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩

লুম্বিনী দক্ষিণ এশিয়ার মহাদেশের কোন দেশে অবস্থিত, চিহ্নিত করে রং করো।

জন্মবৃত্তান্ত

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। এ উপলক্ষ্যে কপিলাবস্তু নগরীতে আয়োজিত হলো উৎসব। উৎসব শেষে রাজা-রানি ঘুমিয়ে পড়লেন। সে রাতে রানি মায়াদেবী দেখলেন অদ্ভুত এক স্বপ্ন – চারদিক থেকে চার দিকপাল দেবতা এসে তাঁকে শয্যাসহ তুলে নিলেন। হিমালয়ের এক মনোরম স্থানে তাঁর পালঙ্ক রেখে দেবতারা সরে দাঁড়ালেন। দেব মহিষীরা এসে মায়াদেবীকে মানস সরোবরে স্নান করালেন। সুবাসিত দিব্যবস্ত্রে ভূষিত করে নিয়ে গেলেন এক সোনার প্রাসাদে। সেখানে রানি মায়াদেবীকে তাঁরা সোনার পালঙ্কে পূর্ব দিকে মাথা রেখে শুইয়ে দিলেন।

তারপর পাশের স্বর্ণ-পর্বত থেকে একটি সাদা হাতি এলো। সেই হাতির শুঁড়ে ছিল একটি শ্বেতপদ্ম। সে সোনার প্রাসাদে প্রবেশ করে তিনবার রানির শয্যা প্রদক্ষিণ করল। তারপর রানির জঠরের দক্ষিণ দিকে শ্বেতপদ্মটি প্রবেশ করিয়ে দিল। রানির দেহ-মনে এক অপূর্ব শিহরণ খেলে গেল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রানির।

পরদিন সকালে রানি তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত রাজা শুদ্ধোদনকে জানালেন। রাজা তা শুনে খুব বিচলিত হলেন এবং জ্যোতিষীদের ডেকে এ স্বপ্নের কারণ খুঁজতে বললেন। জ্যোতিষীরা বিশদ পর্যালোচনা করে রাজাকে বললেন, মহারাজা, এটি অত্যন্ত সুখপ্রদ স্বপ্ন, এই রাজ্যের জন্য পরম সৌভাগ্যের ইঙ্গিত; আনন্দ করুন, রানি মায়াদেবীর পুত্রসন্তান হবে। এই রাজপুত্র ভবিষ্যতে মহাতেজস্বী ও যশস্বী মহাপুরুষ হবেন। আমাদের কপিলাবস্তু রাজ্যের এ যেন পরম প্রাপ্তি। এক মহাপুরুষ জন্ম নেবেন শাক্যবংশে। স্বাগত হে রাজপুত্র!

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে রাজা ও রানির মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়। কিছুদিন পর এলো বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি। সেই পূর্ণিমার শুভলগ্নে রানির বাসনা হলো পিত্রালয়ে যাওয়ার । রাজা শুদ্ধোদন সব ব্যবস্থা করলেন। কপিলাবস্তু থেকে দেবদহ পর্যন্ত পথ সুসজ্জিত করা হলো। রানি মায়াদেবী সহচরীসহ সোনার পালকিতে চড়ে পিত্রালয়ে চললেন। পথে রানি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলেন। তখন পালকি পৌঁছালো দুই নগরীর মধ্যবর্তী স্থান লুম্বিনী কাননে। রানির নির্দেশে লুম্বিনী কাননে শালগাছের এক মনোরম স্থানে পালকি থামল। শালবনের শাখায় শাখায় ফুল, পাখির কাকলি। রানি একটু বিশ্রাম নিতে শালতরু তলে দাঁড়িয়ে তার একটি শাখা ধরলেন। ঠিক সেসময় তাঁর প্রসববেদনা শুরু হলো। সহচরীরা চারদিকে কাপড় দিয়ে ঘিরে দিলেন সে স্থান। সেখানেই শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় ভূমিষ্ঠ হন জগতের ভাবী বুদ্ধ সিদ্ধার্থ গৌতম । বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে, এ সময় চার মহাব্রহ্মাসহ দিকপাল দেবতা নবজাত সিদ্ধার্থের পরিচর্যা করেছিলেন।

রাজপুত্রের জন্মের সংবাদ পৌঁছে গেল রাজা শুদ্ধোদনের কাছে। কপিলাবস্তুতে শুরু হলো উৎসব। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে সেই আনন্দের ধারায় নেমে এলো বিষাদের ছায়া । কুমার সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর রানি মায়াদেবীর মৃত্যু হলো। মাতৃহারা হলেন কুমার সিদ্ধার্থ। তখন সিদ্ধার্থের প্রতিপালনের ভার নিলেন বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। রানি গৌতমী তাঁকে পুত্রস্নেহে পালন করেছিলেন। গৌতমীর নামানুসারে সিদ্ধার্থের আর এক নাম হয়-গৌতম।

পরবর্তীকালে গৌতম নামটি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিশ্বে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত। সকল জীবের প্রতি তাঁর মৈত্রী ও করুণা অপরিমেয় বলে তিনি মহাকারুণিক নামেও অভিহিত। এছাড়া তাঁর অপরিমিত গুণরাশিকে কেন্দ্র করে তাঁকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়। যেমন সুগত, ভগবান, তথাগত প্রভৃতি।

ইতোমধ্যে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মকথা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। এ সময় হিমালয় পর্বতের পাশে কালদেবল নামের এক মহা ঋষি বাস করতেন। তিনি কপিলাবস্তু নগরে গিয়ে গৌতমকে দর্শন করেন। তিনি গৌতমের বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। রাজা শুদ্ধোদনকে তিনি বলেছিলেন, কুমার গৌতম যদি গৃহে থাকেন, তাহলে তিনি রাজচক্রবর্তী হবেন, আর যদি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন, তাহলে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। এই মহা ঋষির মন্তব্যের প্রথম অংশ রাজা ও রানিকে আনন্দিত করলেও সংসার ত্যাগের কথায় তাঁরা বিচলিত হন। কুমার সিদ্ধার্থ ভবিষ্যতে সন্ন্যাসব্রতের কথা যাতে না ভাবেন, সে জন্য রাজা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪

সিদ্ধার্থ গৌতমের পরিবার বৃক্ষ (Family Tree)টি পূরণ করো।

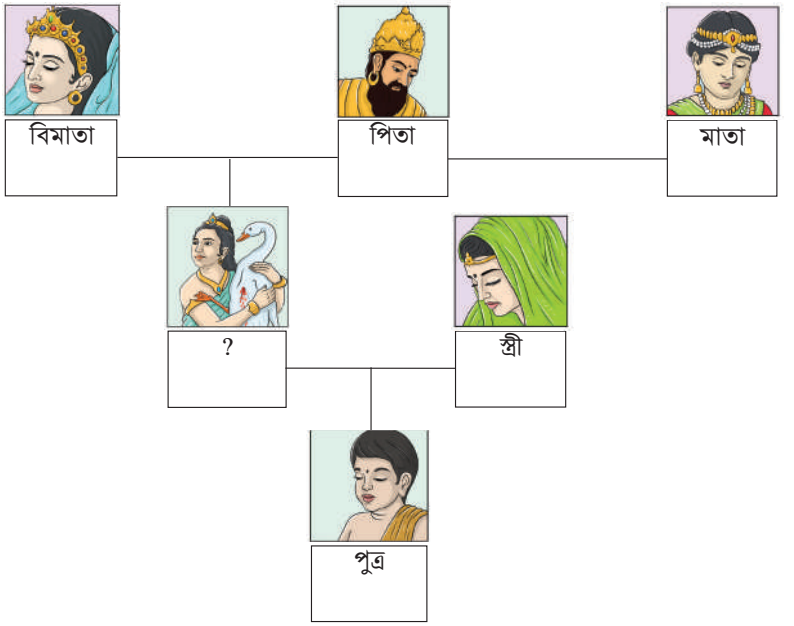

বাল্যজীবন

যথাসময়ে শুরু হলো সিদ্ধার্থ গৌতমের বিদ্যাশিক্ষা। সে সময়ে ৬৪ রকম লিপির প্রচলন ছিল। গুরুর সান্নিধ্যে তিনি প্রচলিত লিপি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেন। ক্রমে তিনি বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, যোগ, ন্যায়, গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা শেখেন। ক্ষত্রিয় রাজকুমার হিসেবে তিনি শেখেন রাজনীতি, মৃগয়া, ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ, রথচালনা ইত্যাদি। একবার তিনি শাক্য কুমারদের সঙ্গে রথচালনা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় একবারে জয়ের মুখে পৌঁছে রথের রাশ ছেড়ে দিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্তকে জয়লাভের সুযোগ করে দেন। এতে গৌতম খুব আনন্দ লাভ করেন। আর একবার শিকারে গিয়ে হাতের শিকার একটি হরিণ শাবককে ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীদের বিরক্তি উৎপাদন করেন। কিন্তু হরিণ শিশুর প্রাণ রক্ষা হওয়ার আনন্দে তিনি অভিভূত হন। দুই ক্ষেত্রেই তিনি বন্ধুদের কাছে ধিক্কার লাভ করেন। আর একবার রোহিণী নদীতে বড় একটি গাছ পড়ে বাঁধের সৃষ্টি করল। এতে পানি চলাচলসহ নদীপথে যাতায়াতে সমস্যার সৃষ্টি হলো। তখন তিনি নিজ বুদ্ধিবলে তা অপসারিত করেন।

সিদ্ধার্থ গৌতমের বয়স ক্রমে বাড়তে লাগল। কৈশোর পেরিয়ে জীবন এগিয়ে চলছে। একদিন তিনি রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে ছিলেন। এসময় একদল বুনো হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে। তাদের ডানার শব্দে বন মুখরিত। তিনি অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন মুক্ত পাখিদের চলার দিকে। তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠল।

হঠাৎ এই আনন্দের মাঝে এলো বিষাদের ঘনঘটা। একটি হাঁস তিরবিদ্ধ হয়ে নিচে পড়ে গেল তাঁর কোলের কাছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে হাঁসের সর্বাঙ্গ। গৌতমের মন বেদনায় কেঁদে উঠল। তাড়াতাড়ি মমতাভরে হাঁসটিকে তিনি তুলে নিলেন নিজের কোলে। সরিয়ে নিলেন হাঁসের বুকের তির। আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল হাঁস।

হাসি ফুটল সিদ্ধার্থের মুখে। অমনি এসে উপস্থিত হলেন মামাতো ভাই দেবদত্ত। চিৎকার করে দেবদত্ত বলল– আমার শরে আহত পাখি, আমাকে দাও। সিদ্ধার্থ গৌতম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, এই আহত পাখিকে সেবা করে আমি ভালো করে তুলেছি। এই পাখি আমার।

দেবদত্ত বললেন, একে আমি তিরবিদ্ধ করেছি। এর ওপর আমার অধিকার। গৌতম বললেন, প্রাণঘাতীর চেয়ে প্রাণদানকারীর দাবি বেশি। কাজেই এ পাখি আমার। শাক্যরাজ্যের বিনিময়েও এই হাঁস আমি কাউকে দেব না। আকাশের পাখি আকাশে উড়িয়ে দেব।

এতে ক্ষিপ্ত ও রাগান্বিত হলেন দেবদত্ত। তারপর বিচার বসল রাজদরবারে। গৌতমের এক কথা-প্রাণঘাতীর চেয়ে প্রাণদানকারী বড়। প্রাণদাতার দাবিই বেশি। তিনি আরও বললেন, আমার মতো এ পাখিরও প্রাণ আছে। আঘাত করলে তোমার ও আমার যেমন যন্ত্রণা হয়, ওরও তেমনি যন্ত্রণা হয়। কিন্তু ওর মুখে আমাদের মতো ভাষা নেই। মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না। তবুও তুমি তাকে তির মারলে।

দেবদত্ত বললেন, তোমার এত কথার প্রয়োজন দেখি না। এই হাঁস আমি শরবিদ্ধ করেছি। কাজেই আমি এর একমাত্র দাবিদার।

বিচারে অবশেষে প্রাণদানকারীর জয় হলো। গৌতম দুই হাতে আদর করে আকাশের পাখি আকাশে উড়িয়ে দিলেন। আর যেতে যেতে পাখিটি গৌতমের দিকে তাকাতে লাগল।

সিদ্ধার্থের কাছে দেবদত্ত আহত পাখি দাবি করছে।

বয়স কম হলেও পৃথিবীর যাবতীয় চিন্তা যেন গ্রাস করেছে সিদ্ধার্থ গৌতমকে। তিনি থাকেন সর্বদা চিন্তাশীল। রাজপ্রাসাদের ভিতরেও গৌতমের মন ভরে না। তাঁর আনন্দের জন্য রাজা শুদ্ধোদন নৃত্য, গীতসহ আনন্দের উপকরণের কিছুই বাকি রাখেননি। গৌতমের মন তাতে সন্তুষ্ট নয়। সুযোগ পেলেই তিনি কোনো অজানা চিন্তায়

মগ্ন হন। রাজা শুদ্ধোদন এতে বিচলিত হয়ে পড়েন।

এ সময় রাজার বিচক্ষণ মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন, কুমারের জন্য গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতঋতু উপযোগী তিনটি প্রাসাদ তৈরি করতে হবে। শুদ্ধোদন তার ব্যবস্থা করলেন। ভোগ ও বিলাসের জন্য সব সুযোগ করে দিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ গৌতমের কাছে সেসব ছিল মূল্যহীন। রাজকুমারের গভীর মৌনতা ও চিন্তামগ্ন স্বভাবে বিচলিত হয় রাজা ও রানির মন। তাঁরা কুমারের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেন।

গৌতমের বয়স তখন ষোলো বছর। এ সময় রাজা শুদ্ধোদন ছেলেকে বিয়ে দিয়ে গৃহমুখী করতে চাইলেন। সেকালের রীতি অনুযায়ী ঠিক হলো গৌতম অশোকভাণ্ড বিতরণ করবেন। বিবাহযোগ্য রমণীরা উৎসবে এসে যে উপহার গ্রহণ করেন, তার নাম অশোকভাণ্ড । এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিবাহযোগ্য সব শাক্যকুমারী গৌতমের হাত থেকে অশোকভাণ্ড উপহার গ্রহণ করবেন। কুমারের বিবেচনায় সেরা সুন্দরী গ্রহণ করবেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। শেষে সেই শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হবেন তাঁর স্ত্রী।

একে একে সব শাক্যকুমারী উপহার নিয়ে গেলেন। অশোকভাণ্ড শেষ। তারপর এলেন গোপাদেবী। কুমার গৌতম রাজঅঙ্গুরীয় দিয়ে বরণ করলেন গোপাদেবীকে। যিনি যশোধরা নামেও পরিচিত। সবাই বুঝলেন- গোপাদেবীই তাঁর মনোনীত বধূ। কিন্তু তারপরও গৌতমকে শক্তি ও বিদ্যার প্রমাণ দিতে হলো। সবার সামনে গৌতম প্রমাণ করলেন, তিনি সব শাস্ত্রে পারদর্শী। পুরাণ, ইতিহাস, গণিত, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি –সব বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ গণ্য হলেন।

তারপর শুভদিন শুভক্ষণে সারা রাজ্যে উৎসব হলো। বিয়ে হলো সিদ্ধার্থ ও গোপাদেবীর। রাজা শুদ্ধোদন ভাবলেন, রাজকুমার এবার সংসারী হবেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি হবেন নিশ্চিন্ত।

চার নিমিত্ত দর্শন

এদিকে রাজকুমারের মনে বিরাজ করে এক অজানা অনুসন্ধানী প্রত্যাশা। ক্রমে গৌতমের বয়স হলো উনত্রিশ বছর। বয়সের দিক থেকে তিনি এখন অনেক পরিণত। জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন বিভিন্ন বিষয়। সংসারের অসারতা তিনি বুঝে ফেলেছেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তিনি আরও জানতে চান। এ সময় তাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়।

একদিন গৌতম ঠিক করলেন, নগর ভ্রমণে বের হবেন। রাজা শুদ্ধোদনও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিলেন। পাশাপশি এই পদক্ষেপও নিলেন যে, যাতে কুমারের যাওয়ার পথে দুঃখ কষ্টের কোনো দৃশ্য না থাকে। যথারীতি কুমার একদিন তাঁর সারথি ছন্দককে বললেন, রথ সাজাও, আমি ভ্রমণে যাব। ছন্দক রথ সাজিয়ে আনলেন। প্রথমে যাত্রা করলেন পূর্ব দিকে। রাজার আদেশে চলছে চারদিকে আনন্দ, বাদ্য ও গীতধ্বনি। গৌতমের মনে হলো জগতে দুঃখ নেই, শোক নেই, কান্না নেই, হতাশা নেই। আছে আনন্দ, শোভা ও সুষমা। হঠাৎ গৌতম চিৎকার করে সারথিকে ডেকে বললেন, এ কোথায় নিয়ে এলে ছন্দক, কোন রাজ্যে আমরা রথে চড়ে ঘুরছি? ওই দেখো কে যায়? তার হাত কাঁপছে, পা টলছে, ঘাড় দুলছে। কে সে?

ঘোড়ার গতি থেমে গেল। বিষাদে ছেয়ে গেল ছন্দকের মন। তিনি বললেন, উনি এক বৃদ্ধ। বার্ধক্যের কারণে শরীরের এই জীর্ণ অবস্থা। গৌতম বললেন, সবার কি এই দশা হবে? আমারও?

ছন্দক বললেন, হ্যাঁ। সকলকে একদিন বৃদ্ধ হতে হবে।

অমনি গৌতম বললেন, ছন্দক, রথ ঘোরাও। আমি আজ ভ্রমণে যাব না। আমার মন ভালো নেই। রথ ফিরে এলো প্রাসাদে।

আর একদিন গৌতম ভ্রমণে বের হলেন। সেদিন আরও সর্তক হলেন রাজা। আবার ঘোষণা করে দিলেন রাজপথে যেন বৃদ্ধ বা অসুস্থ কেউ না যায়। কোনো দুঃখের দৃশ্য যেন গৌতমের চোখে না পড়ে। রথ ছুটে চলল। এবার দক্ষিণ দিকে। পথে পথে সুন্দরের সমারোহ, পাখির কাকলি, আনন্দের স্রোতোধারা। এমন সময় গৌতম দেখলেন এক অসুস্থ ব্যক্তি। দাঁড়াতে পারে না, চলতে পারে না। শরীর কাঁপছে, বেদনায় কাতর। কষ্টে হা-হুতাশ করছে।

গৌতম প্রিয় সারথিকে বললেন, রথ থামাও। ছন্দক! কে ওই লোক, কেন তার এত কষ্ট, কেন অমন করছে? রথ থামালেন ছন্দক। বললেন, উনি এক রোগী। অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন।

গৌতম বললেন, সব মানুষই কি রোগের বশীভূত? আমারও কি এই দশা হবে? গোপাদেবীরও কি এই অবস্থা হবে? ছন্দক বুঝিয়ে দিলেন, জীবমাত্রেরই রোগ আছে। গৌতম সেদিনও নগরভ্রমণ বন্ধ করে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

অন্য আর একদিন। এবার পশ্চিম দিকে চলল রথ। আনন্দের লহরি চলছে চারদিকে। এমন সময় তিনি দেখলেন, চারজনের কাঁধে এক শবাধার। পিছনে পিছনে চলছে কান্নারত বহু মানুষ।

গৌতম বললেন, ছন্দক, কে ওই শবাধারে? কেন এই শোক করছে? কেন ওরা কান্নায় মোহ্যমান?

ছন্দকের হৃদয় অস্থির হলেও প্রিয় রাজকুমারকে সব বুঝিয়ে বলতে হলো। পরিচয় করিয়ে দিতে হলো জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি মৃত্যুর সঙ্গে।

গৌতম আর ভ্রমণে গেলেন না। ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে।

আর একদিন বের হলেন উত্তর পথে। এবারও তাঁর চোখ খোলা, যদি দেখতে পান আনন্দের কিছু! এবার সত্যিই দেখলেন আনন্দের দৃশ্য। গৃহত্যাগী এক তরুণ সন্ন্যাসী। অরুণ বরণ তাঁর গায়ের রং। সৌম্য, দিব্য চেহারা। প্রসন্ন হাসি লেগে আছে মুখে। দুঃখের লেশমাত্র নেই চলার গতিতে ও মনে। গৌতম জিজ্ঞেস করলেন, ছন্দক! ইনি কে? দুঃখ তাঁকে কি স্পর্শ করে না? ছন্দক বললেন, তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর ঘরবাড়ি নেই। আত্মীয়স্বজনের মায়া তিনি ত্যাগ করেছেন। সব কিছু বুঝে ফেললেন গৌতম। সন্ন্যাসীর মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন নিজেকে। জরা, ব্যাধি, মরণের কথাও মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। নতুন চৈতন্যে জেগে উঠলেন তিনি। নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তারপর ছন্দককে বললেন, রথ ঘোরাও, আমি আর কোথাও যাব না।

প্রাসাদে এসে রাজকুমার নিজের চিত্তকে দৃঢ় করলেন। উপলব্ধি করলেন, এখন সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে তিনি নিজেও দুঃখ থেকে মুক্তি পাবেন না। অন্যদেরও মুক্ত করতে পারবেন না। কারণ, ভ্রমণে গিয়ে তিনি যে চারটি দৃশ্য দেখলেন, সে দৃশ্য তাঁর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে। এই চারটি দৃশ্যকে বৌদ্ধ সাহিত্যে 'চারি নিমিত্ত' নামে অভিহিত করা হয়। চার নিমিত্ত থেকে বন্ধনমুক্ত জীবন 'সন্ন্যাস' অবলম্বনকেই রাজকুমার শ্রেয় মনে করলেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫

চার নিমিত্তের চারটি দৃশ্য লেখো

১.
২.
৩.
৪.

গৃহত্যাগ

সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে ধরণি আলোকিত। সে আলোয় প্রদীপ্ত হলো রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের অন্তর। জগতের এই অনিবার্য দুঃখ-ক্লেশ থেকে কীভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়। কীভাবে সকলের জন্য মুক্তির পথ উন্মুক্ত করা যায় – এই চিন্তায় তিনি বিভোর। এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। উপলব্ধি করলেন, সংসারের মোহে তিনি আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। তিনি অনুভব করলেন, এ বাঁধন থেকে মুক্ত হতেই হবে। সংসারের বন্ধন ছিন্ন করার অভিলাষ পূরণের এটাই যেন উপযুক্ত সময়।

স্ত্রী-পুত্রকে সিদ্ধার্থ শেষবার দেখে নিচ্ছেন।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চারিদিক নিস্তব্ধ। প্রাসাদে সকলেই ঘুমে আচ্ছন্ন। তিনি ডাকলেন প্রিয় সারথি ছন্দককে বললেন, আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। আমি গৃহত্যাগ করব।

আদেশ পালনকারী ছন্দক অশ্ব কন্থককে সাজিয়ে আনলেন। বিদায়ের আগে গৌতম একবার গোপাদেবীকে দেখতে গেলেন শয়নঘরে। পুত্র রাহুলকে বুকে জড়িয়ে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে আর জাগালেন না।

বিলম্বের কারণে মনের স্থিরতা নষ্ট হতে পারে, তাই শিগগির যাত্রা করা উচিত। সংসারের মায়া-মোহের বন্ধন ত্যাগ করে যাত্রা করলেন অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে। ঘোড়ায় চড়ে অনোমা নদীর তীরে পৌঁছলেন। পিছনে পড়ে রইল রাজপ্রাসাদ। সামনে অনোমা নদী। কুলকুল করে বইছে নদীর জলস্রোত। অনোমার তীরে এসে ঘোড়া থামালেন। রাজকুমার গৌতম বললেন, আর নয় ছন্দক, এখান থেকে তুমি ফিরে যাও।শুনে বুক ভেঙে যায় ছন্দকের। কিন্তু উপায় নেই। কুমারের আদেশ হলো– কন্থককে নিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে যাও।

তারপর তিনি গায়ের রাজ আভরণ খুলে ছন্দকের হাতে দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন। গৌতমের বিয়োগব্যথা তাঁর ঘোড়া কন্থককে বিষাদে আক্রান্ত করল। প্রভুর বিদায়-দুঃখ সইতে না পেরে সেখানে প্রাণত্যাগ করল কন্থক। বেদনাক্রান্ত হৃদয়ে ছন্দক ফিরে চললেন কপিলাবস্তুর দিকে। অন্যদিকে গৃহত্যাগী কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম হেঁটে চললেন অনোমার তীর ধরে, বনের দিকে। কুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের এই মহা অভিপ্রায়ের অভিযাত্রাকে বলা হয় 'মহা অভিনিষ্ক্রমণ'।

বুদ্ধত্ব লাভ

দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণে গৃহত্যাগী হলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম। নদী পেরিয়ে বন ও পাহাড়। গৌতম মুক্ত মনে চলতে লাগলেন। জীবনের দুঃখ জয়ের অনুসন্ধানী লক্ষ্যে। নদীর তীরে ঋষিদের আশ্রম। কিন্তু তিনি মহান ব্রত নিয়ে চললেন শীর্ষস্থানীয় কোনো ঋষির সান্নিধ্য লাভের আশায়, যাঁকে তিনি সাধনপথের গুরু হিসেবে গ্রহণ করবেন। সাত দিন সাত রাত কাটিয়ে তিনি পৌঁছালেন বৈশালী নগরে। সেখানে স্বনামধন্য ঋষি আলাঢ় কালামের আশ্রম। তাঁর কাছে শিক্ষা অনুশীলন করলেন দর্শন, সমাধির সাত স্তর। সেখান থেকে রামপুত্র রুদ্রকের কাছে গিয়ে সমাধির আরেকটি স্তর শিখলেন। সেখান থেকে রাজগৃহের আরেক সাধকের কাছে গেলেন। সে সময় রাজগৃহের রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রাজা বিম্বিসার কুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের দিব্যকান্তি দেখে মুগ্ধ হন। রাজা বিম্বিসার তাঁকে সম্পত্তি ও রাজ্যের উঁচুপদ দিতে চাইলেন। কিন্তু যিনি নিজ রাজ্য ছেড়ে এসেছেন, তাঁর আবার লোভ কিসের? রাজগৃহ থেকে গেলেন উরুবেলায়। জায়গাটি তাঁর পছন্দ হলো। দুঃখের শেষ কোথায় জানার জন্য শান্তির পথ খোঁজার মানসে তিনি সেনানী গ্রামে পৌঁছালেন। সেখানে একটি সুন্দর বন দেখতে পেলেন। তার পাশে একটি নদী, নাম নৈরঞ্জনা। এলাকাটিও ছিল নীরব ও নির্জন। গভীর ধ্যানের জন্য উপযুক্ত মনে হলো।

অনোমা নদীর তীর

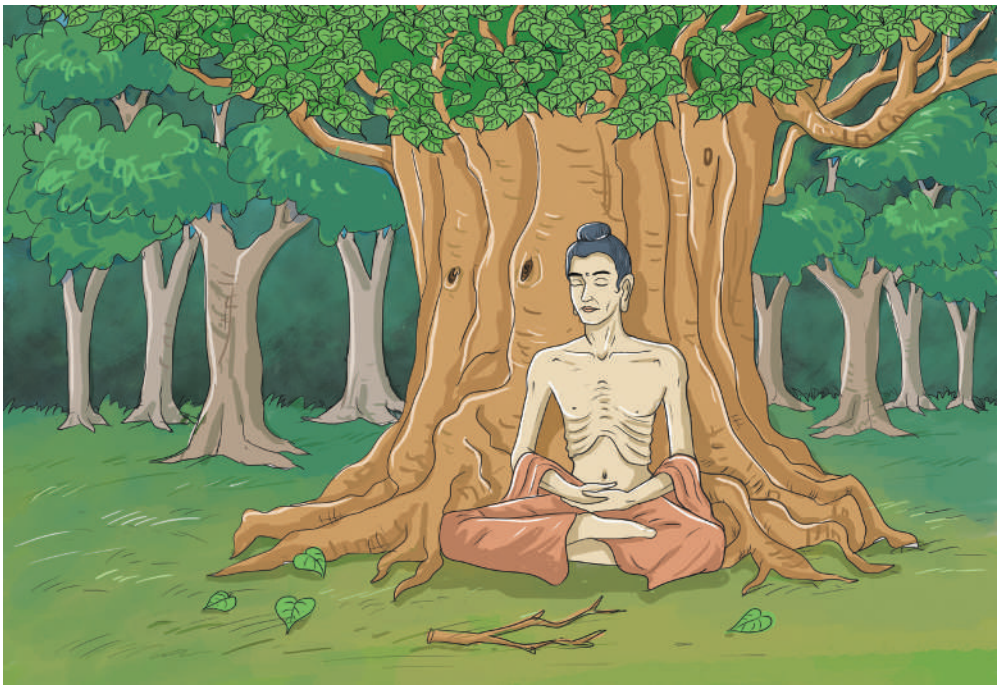

সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যা

আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে কঠিন ব্রতে মনোনিবেশ করলেন সিদ্ধার্থ। ইতোমধ্যে তিনি দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনা করলেন। শরীর জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেল। হাঁটতে গেলে পড়ে যান, বসলে উঠতে পারেন না। তবুও দুঃখের শেষ কোথায় জানা হলো না। তখন তিনি বুঝলেন, কঠোর তপস্যায় জীবন বিপন্ন হয়। তাই তিনি অল্প অল্প আহার করে 'মধ্যপন্থা' অবলম্বন করলেন। একেবারে কঠোর সাধনা নয়, আবার বিলাসী জীবনও নয়। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবহমান রাখা ও মানসসিদ্ধিতে সচেতন থাকা আবশ্যক মনে করলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, হয় ধ্যানে সিদ্ধিলাভ অথবা মৃত্যু। এর অন্যথা নয়। এরকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ধ্যান অনুশীলনের এক সকালে সেখানে বনদেবতার পূজা দিতে আসে এক শ্রেষ্ঠীকন্যা, নাম সুজাতা। সুজাতা ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীকে গভীর শ্রদ্ধায় পায়সান্ন দান করলেন। সুজাতার দেওয়া দান তিনি গ্রহণ করলেন। তারপর আবার ধ্যানস্থ হলেন এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বসে । সেদিন ছিল বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি।

সে ধ্যানেই রাতের প্রথম প্রহরে তিনি জাতিস্মর জ্ঞান বা পূর্বজন্মের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলেন। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে তিনি দিব্যচক্ষু সম্পন্ন হলেন। তৃতীয় প্রহরে বুঝতে পারলেন জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর উৎপত্তি বিষয় । এ সময় 'চার আর্যসত্য' সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি করলেন। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের পথ তিনি খুঁজে পেলেন। এরই নাম চার আর্যসত্য। এই অপূর্ব জ্ঞানময় অর্জনকে বলা হয় 'সম্যক সম্বোধি বা বুদ্ধত্ব'। এ সময় তিনি জগতে খ্যাত হলেন 'বুদ্ধ' নামে। সেই থেকে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত। তারপর তিনি জগতের মানুষের কল্যাণে তাঁর অর্জিত জ্ঞান প্রচার করবেন- এ প্রতিজ্ঞা করলেন। এ সময় তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। যে অশ্বত্থগাছের নিচে বসে তিনি জ্ঞান লাভ করলেন, তার নাম হলো 'বোধিবৃক্ষ'। যে স্থানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন সেই স্থানের নাম ছিল গয়া। পরবর্তীকালে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই গয়া অঞ্চলটি 'বুদ্ধগয়া' নামে খ্যাত হয়। এটি বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশে অন্তর্গত।

সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভ

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬

'রাজকুমার সিদ্ধার্থ থেকে বুদ্ধ' – এই পরিবর্তনের লক্ষণীয় বিষয়গুলো কী কী লেখো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ধর্ম প্রচার

বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি চিন্তা করলেন তাঁর এ নতুন তত্ত্ব সাধারণ জাগতিক মানুষের চিন্তার অতীত। সুতরাং এই তত্ত্ব কার পক্ষে বোঝা সম্ভব। জগতে কে বুঝতে সক্ষম হবে সত্য তত্ত্ব। তারপর তিনি দিব্যদৃষ্টিতে চতুর্দিক অবলোকন করলেন। দেখলেন, সারনাথে জীবনের উৎস অনুসন্ধানী পাঁচজন সাধক আছেন। যারা একসময় তাঁর সহযোগী ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যেই তিনি যাত্রা করলেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে পৌঁছলেন সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে। সেখানে পাঁচজন সাধকের সঙ্গে একত্রিত হলেন, যাঁরা দীর্ঘকাল সেখানে সাধনারত ছিলেন। তিনি তাঁদের কাছে নতুন ধর্মতত্ত্ব প্রচার করলেন। পাঁচজন সাধক এই ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে যেন নতুন জীবন লাভ করলেন। তাঁরা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিলেন। তাঁরা হলেন বুদ্ধের প্রথম শিষ্য। তাঁদের একত্রে বলা হয় 'পঞ্চবর্গীয় শিষ্য'। এই পাঁচজন ভিক্ষুর মাধ্যমেই বুদ্ধ প্রথম 'ভিক্ষুসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর শ্রেষ্ঠী কুমার যশ, যশের পিতা এবং ৫৪ জন সহযোগীকে বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘে গ্রহণ করলেন। তিনি এই ৬১ জন ভিক্ষুকে চারদিকে প্রেরণ করেন ধর্ম প্রচার করার জন্য। এ সময় তথাগত বুদ্ধ নিজেও শিষ্য-প্রশিষ্যসহ বহু স্থানে পরিভ্রমণ করে তাঁর ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছেন। এভাবে দীর্ঘ ৪৫ বছর তিনি জীবজগতের কল্যাণের মহান ব্রত নিয়ে তাঁর অধিগত ধর্ম-দর্শন প্রচার করেন।

মহাপরিনির্বাণ

তথাগত বুদ্ধের ধর্মাদর্শ জগতে নতুন চেতনার সৃষ্টি করল। এই প্রথম মানুষ শুনল নিজের প্রচেষ্টাতেই তার ভবিষ্যৎ নিহিত। নিজের কর্মই নিজের ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ, কর্মের মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ। এ রকম আত্মবিশুদ্ধিতার বার্তা নিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ালেন।

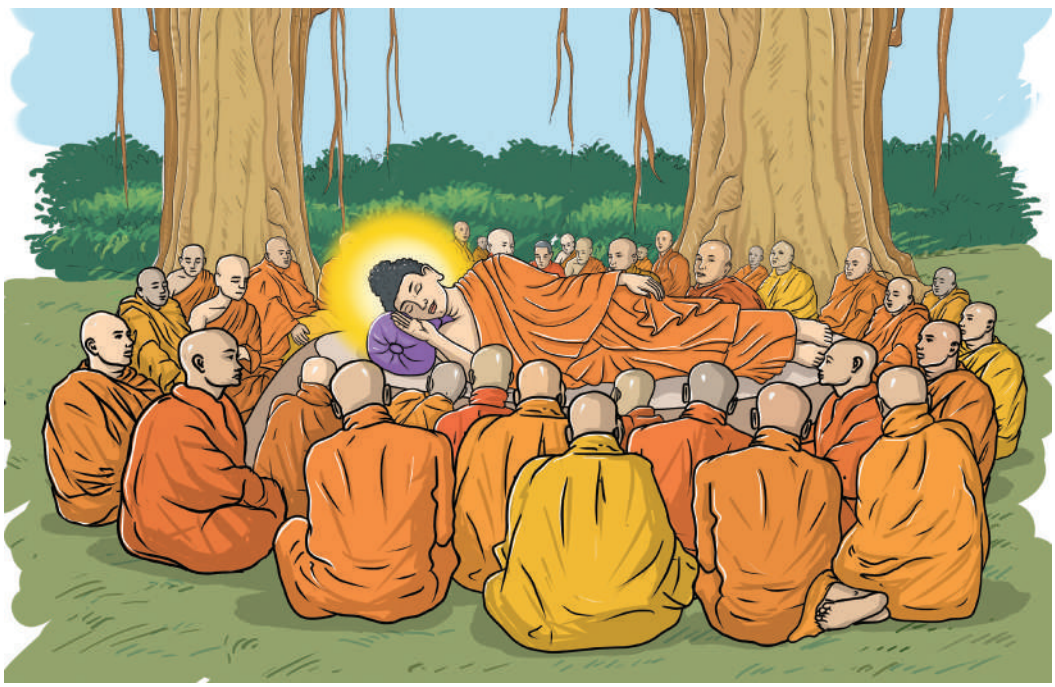

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ

প্রচারিত হলো তাঁর ধর্মাদর্শ। এভাবে তিনি ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করেন।জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি রাজগৃহ থেকে বৈশালী হয়ে কুশীনগর গমন করেন। কুশীনগরের কাছে পাবা নগরে উপস্থিত হয়ে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পাবা থেকে তিনি মল্লদের শালবনে পৌঁছালেন। এ সময় তাঁর প্রধান সেবক আনন্দকে বললেন, তাঁর শয়নের ব্যবস্থা করতে। আনন্দ যমক শালগাছের নিচে শয্যাসন প্রস্তুত করলেন। তথাগত বুদ্ধ সেখানে শায়িত হলেন। তখন বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। আনন্দকে বললেন, ভিক্ষুদের তাঁর কাছে সমবেত করতে। ভিক্ষুগণ শয্যার চার পাশে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বসলেন। প্রধান শিষ্য আনন্দ কাছে এলেন। বুদ্ধ তখন তাঁর শেষ বাণী বললেন, ‘হে ভিক্ষুগণ! উৎপন্ন হওয়া জীবমাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তোমরা সচেতন হয়ে অপ্রমাদের সঙ্গে নিজ নিজ কাজ করবে।’ তথাগতের এ শেষ বাণী।

তারপর আস্তে আস্তে বুদ্ধ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। রাতের শেষ যামে ধ্যানের চতুর্থ স্তরে পৌঁছে জগতের আলো বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। সপ্তাহব্যাপী তাঁর মরদেহ রাখা হয়। ভারতবর্ষের সব রাজন্য ও শ্রেষ্ঠী সমবেত হন মল্ল রাজ্যে। আয়োজন করা হয় মহা মর্যাদাপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ তাঁর চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন। তারপর উপস্থিত সব রাজ্যের রাজন্যবর্গ তথাগত বুদ্ধের অস্থিধাতু ও চিতাভস্ম নিতে উদগ্রীব হন। তাঁর পূতাস্থিসমূহ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য আট ভাগ করেন। মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবি, কপিলাবস্তুর শাক্য, অল্লকপ্পকের বুলিয়, রামগ্রামরাজ্যের কোলিয়, বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণরাজ, পাবার মল্লরাজ, কুশীনারার মল্লরাজ পূতাস্থি গ্রহণ করেন। পরে পিপ্পলিবনের মৌর্যরাজ অস্থিধাতু না পেয়ে চিতাভস্ম গ্রহণ করেন। এগুলো প্রতিটি রাজ্যের রাজাগণ নিজ নিজ রাজ্যে স্তূপ নির্মাণ করে পূজার ব্যবস্থা করেন। বর্তমান বিশ্বে বুদ্ধের এই অস্থিধাতু ধর্ম, দর্শন ও ঐতিহ্যের দিক থেকে অমূল্য সম্পদ ও পরম শ্রদ্ধার বস্তু।

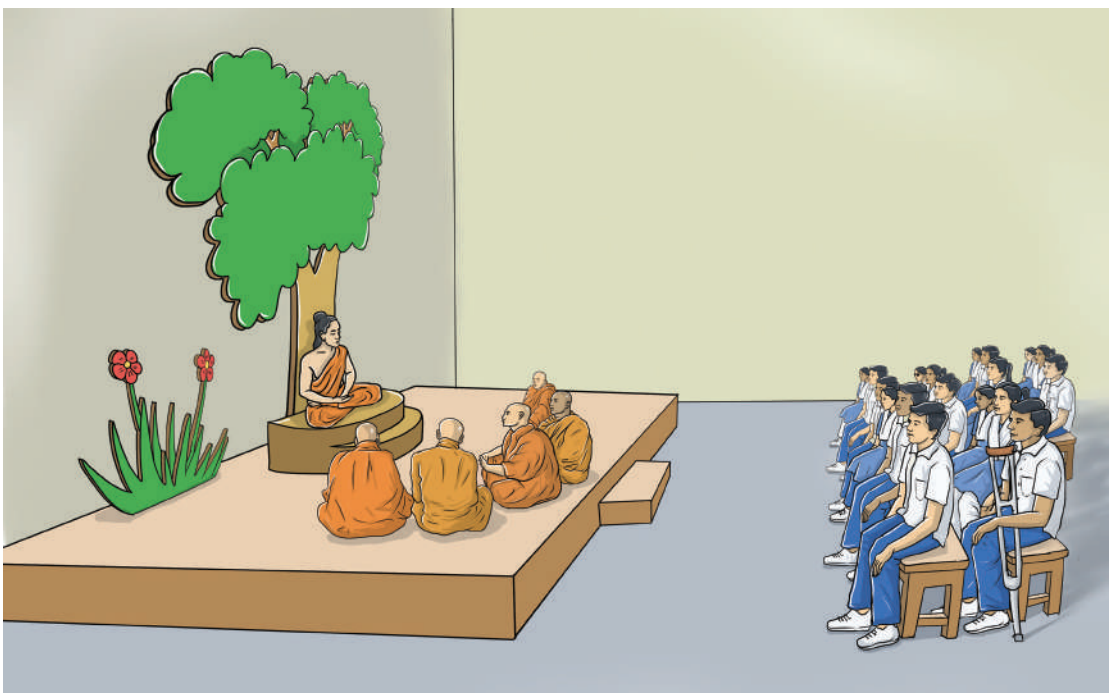

বুদ্ধের জীবনের অভিনয় দেখছে শিক্ষার্থীরা

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৭

চলো সব সহপাঠী মিলে একটি নাটিকার আয়োজন করা যাক। প্রথমে সবাই মিলে নাটিকার স্ক্রিপ্ট তৈরি করি।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৮

নাটিকা আয়োজনের অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?

কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

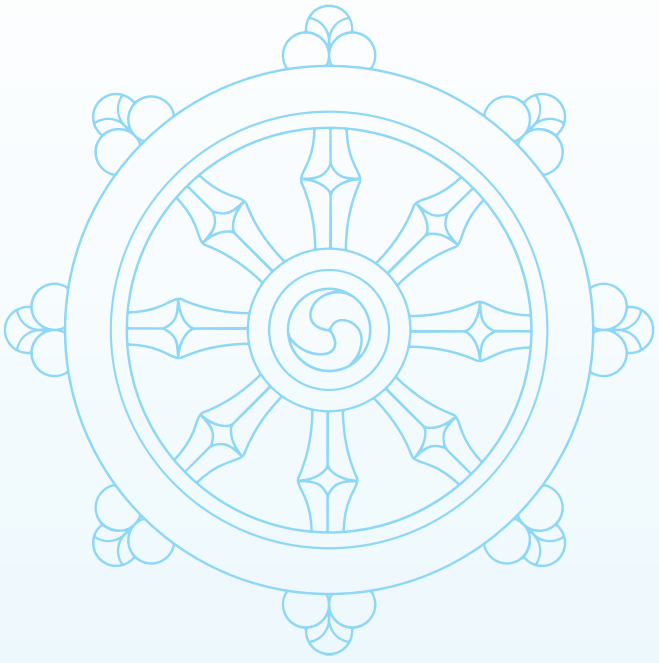

বিনয় পিটক

এ অধ্যায় শেষে আমরা জানতে পারব–

১. বিনয় পিটকের পরিচয়;

২. বিনয় পিটকের গ্রন্থ ও বিষয়বস্তু;

৩. বিনয় পিটকের গুরুত্ব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৯

চলো স্কুলের বা এলাকার কোনো একটি পাঠাগার/ধর্মীয় বইয়ের দোকান/কোনো বিহারের পাঠাগার ঘুরে আসি। সেখানে খুঁজে দেখি বৌদ্ধ ধর্মের কী কী গ্রন্থ পাওয়া যায়? ধর্মীয় বই /ত্রিপিটক/বিনয় পিটক পেলে কিছুটা পড়তে পারি। সম্ভব না হলে কারো বাসায় যে যে ধর্মীয় বই আছে তা সংগ্রহ করতে পারি অথবা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে পড়তে পারি।

গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীরা।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১০

পাঠাগার/ ধর্মীয় বই এর দোকান /কোনো বিহারের পাঠাগারে যে সকল ধর্মীয় বই দেখলাম ও পড়লাম তার একটি তালিকা তৈরি করি

তালিকা

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১১

পাঠাগার/ ধর্মীয় বই এর দোকান /কোনো বিহার এর পাঠাগারে যে সকল ধর্মীয় বই /ত্রিপিটক/বিনয় পিটক ইত্যাদি দেখলাম এবং পড়লাম সেই অভিজ্ঞতাটি নিচে লিখে ফেলি।

অভিজ্ঞতা

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

বিনয় পিটকের পরিচিতি

'বিনয়' অর্থ নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা। পূর্বের শ্রেণিতে ত্রিপিটক বিষয়ে পাঠের সময় 'পিটক' শব্দটির অর্থ আমরা জেনেছি; আর তা হলো- ঝুড়ি বা পাত্র। সুতরাং, 'বিনয় পিটক' বলতে ত্রিপিটকের যে অংশে নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনবিধি সংরক্ষিত হয়েছে সে অংশকে বোঝায়। নিয়ম রক্ষার জন্য প্রবর্তিত বিধি-বিধান বা আইন বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত। তথাগত বুদ্ধের বিনয় বিধান মূলত ভিক্ষু-শ্রমণদের জন্য। সংসার ত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রমণদের সুষ্ঠু, সুন্দর ও পরিশীলিত জীবন গঠনের জন্য, এবং নৈমিত্তিক জীবনাচারে পরিশুদ্ধতা বজায় রাখার লক্ষ্যে মহাকারুণিক বুদ্ধ বিনয়ের প্রবর্তন করেছিলেন। এতে পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে সাধারণ মানুষের জন্যও রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়।

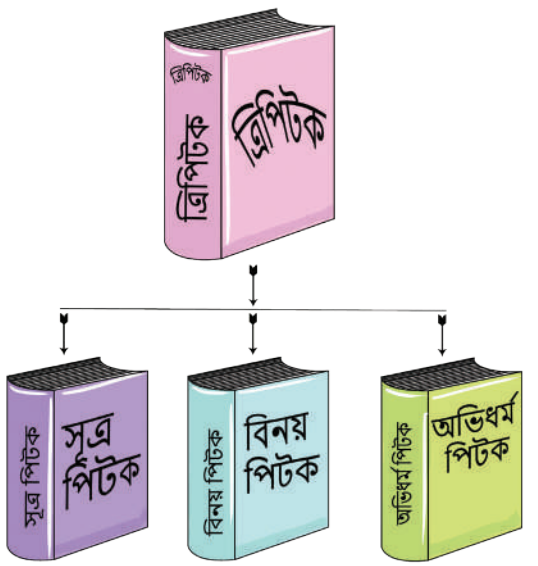

বিনয় পিটক- ত্রিপিটকের অন্তর্গত তিনটি পিটকের একটি। নিয়ম-কানুন, আচার ও অনুশাসন এ পিটকে আলোচিত হয়েছে। নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাই এর মূল উদ্দেশ্য। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর অনেক অনুসারী এ সংঘে অন্তর্ভুক্ত হন। সংঘভুক্ত হয়ে তাঁরা বুদ্ধের শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অবস্থান করেন। সেই সাথে উপসম্পদা গ্রহণ করে ভিক্ষুসংঘে নিয়মিত যুক্ত হয় নতুন সদস্য। তাঁদের অনেকে সদ্ধর্মের গভীর বিষয় অনুশীলনের জন্য বন-জঙ্গালেও অবস্থান করেন। এরকম একজন বৌদ্ধভিক্ষুর অবস্থান যেখানেই হোক না কেন; প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ নিয়মে নিজের জীবন পরিচালনা করবেন। তথাগত বুদ্ধ এ লক্ষ্যেই বিনয় পিটকের প্রবর্তন করেন। এখানে বিধি-বিধান পালনের নির্দেশনা যেমন আছে, তেমনি ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় এই নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অপরাধের পরিত্রাণ বিধিও বর্ণিত হয়েছে। বিষয়ের ভিত্তিতে বিনয় পিটক তিন ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. সুত্তবিভঙ্গ, ২. খন্ধক এবং ৩. পরিবার পাঠ । আবার গ্রন্থ হিসেবে বিনয় পিটক পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেক খন্ডের স্বতন্ত্র নাম আছে। যেমন সুত্তবিভঙ্গের দুটি খন্ড। সেগুলো হলো যথাক্রমে পারাজিক ও পাচিত্তিয়া। তেমনি খন্ধকের দুটি অংশ। মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ। সুতরাং সুত্তবিভঙ্গে দুটি ও খন্ধকে দুটি এবং পরিবার পাঠ মিলে মোট পাঁচটি–বিনয় পিটকের গ্রন্থ।

বিনয় পিটকের বিষয়বস্তু

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বিনয় পিটকের মূল বিষয় নিয়ম, নীতি ও অনুশাসন। এই অনুশাসন বহুমাত্রিক। যেহেতু, প্রাত্যহিক জীবনাচার নিয়ন্ত্রণের সাথে অন্তর্জগৎ পরিশুদ্ধ করাও আবশ্যক। সে লক্ষেই তথাগত বুদ্ধ এই বিধি-বিধানের প্রচলন করেন। কারণ, সুষ্ঠুভাবে দৈনিক কর্ম সম্পদনই একজন ভিক্ষুর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাঁর লক্ষ্য মহৎ। তিনি নির্বাণ সাধনার অভিযাত্রী। তাই, তাঁর দৈনন্দিন জীবনে যেমন নিয়ম-নীতির প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি অনবধানবশত কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযাচিত ঘটনার সম্মুখীন না হওয়ার জন্য চিত্ত নিয়ন্ত্রণের শিক্ষাও প্রয়োজন। আবার কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হলে সে পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের প্রতিবিধানও বিনয় পিটকের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে বিষয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে গ্রন্থেরও নামকরণ হয়েছে। নিচে গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

১. সুত্ত বিভঙ্গ

'সুত্তবিভঙ্গ' শব্দের অর্থ হলো- নীতিমালাসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। এখানে 'সুত্ত' শব্দের অর্থ হলো 'ধারাবাহিক বর্ণনা';আর 'বিভঙ্গ' শব্দের অর্থ হলো 'বিশ্লিষ্ট করণ'। অর্থাৎ বিধির বিশ্লেষণ করে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা। আলোচিত বিষয়ের ভিত্তিতে গ্রন্থের অধ্যায়গুলোর নামকরণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোনাম নির্দিষ্ট। সুত্ত বিভঙ্গের দুটি অংশ; পারাজিক এবং পাচিত্তিয়া।

এখানে পারাজিক খন্ডে পারাজিক ও সংঘাদিসেস নামে দুটি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এগুলো দৈনন্দিন জীবনের সম্ভাব্য দোষ বা আপত্তিমূলক কর্মের ব্যাখ্যা। এ বিষয় জানা থাকলে নিজেকে সম্ভাব্য দোষগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে দূরে রাখা যায়। এখানে 'পারাজিক' মানে পরাজয়। অর্থাৎ, নীতির চ্যুতি বা নিয়ম পালনে অপারগ বা অযোগ্য হওয়াকেই পরাজয় বলা হয়। এই খন্ডে এরকম গুরুতর আপত্তি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

পাচিত্তিয়া খন্ডে পাচিত্তিয়াসহ ছয়টি বিধি বর্ণিত হয়েছে। অন্যগুলো হল অনিয়ত, নিসগ্গিয়া পাচিত্তিয়া,

পটিদেসনীয়, সেখিয়া ও অধিকরণ সমথ। এখানে পাচিত্তিয়া মানে প্রায়শ্চিত্ত করণ। অর্থাৎ কৃত দোষ ত্রুটি স্বীকার পূর্বক পরিত্রাণের সাধনা করার প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ বিষয় এই খন্ডে আলোচিত হয়েছে।

২। খন্ধক

খন্ধক বিনয় পিটকের দ্বিতীয় ভাগ। এতে রাজকুমার সিদ্ধার্থ থেকে বুদ্ধত্বে উপনীত হওয়ার পথে অনুশীলিত রীতি-নীতি ও ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা সংযুক্ত হয়েছে । খন্ধকের বিশেষত্ব হলো এখানে বিনয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধানসমূহ প্রবর্তনের কারণ গুরুত্ব দিয়ে প্রেক্ষাপটসহ বর্ণিত হয়েছে। এতে সময়ের প্রেক্ষাপট হিসেবে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসের ধারাবাহিক তথ্যও পাওয়া যায়। এগুলো খন্ধকের মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ দুটি খন্ডে বিন্যস্ত আছে।

মহাবগ্গ:

বহু বিষয়ের সমন্বিত মূল্যবান গ্রন্থ এটি । এ গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায় অত্যন্ত বিস্তৃত বলে এটি মহাবগ্গ হিসেবে পরিচিত। মহাবগ্গ গ্রন্থে দশটি স্কন্ধ বা অধ্যায় আছে। অন্তর্গত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের রয়েছে স্বতন্ত্র নাম। বিধি-বিধান প্রবর্তনের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যসহ প্রায় সাড়ে তিনশ বিষয় এতে বর্ণিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ হলো সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্বলাভ ও তাঁর ধর্মপ্রচারের ইতিহাস। যেমন- ভিক্ষু সংঙ্ঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ধর্মচক্র প্রর্বতন, পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের দীক্ষা, শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ এবং তাঁর সহচরদের দীক্ষা, রাজা বিম্বিসারের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও রাজার সপারিষদ বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ, সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নসহ কীর্তিমান ভিক্ষুদের উপসম্পদা ও তথাগত বুদ্ধের পারিল্যেয় বনে যাত্রার প্রেক্ষাপটসহ বুদ্ধের জীবনের কালের বহু বিরল ঘটনা এখানে স্থান পেয়েছে।

চুল্লবগ্গ:

'চুল্ল' শব্দের অর্থ হচ্ছে ছোট বা ক্ষুদ্র। এই গ্রন্থের স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদগুলো আকারে মহাবগ্গের স্কন্ধগুলোর তুলনায় ছোট। সে কারণে এই গ্রন্থটিকে চুল্লবগ্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে। চুল্লবগ্গকে মহাবগ্গের বর্ধিত রূপ হিসেবে গণ্য করা যায়। কেননা, মহাবগ্গের অনেক বিষয় ধারাবাহিকভাবে এই গ্রন্থেও আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে, মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গকে একত্রে খন্ধক বলা হয়।

চুল্লবগ্গে ১২টি অধ্যায় আছে। যথা, ১. কর্ম স্কন্ধ; ২. পারিবাসিক স্কন্ধ; ৩. সমুচ্চয় স্কন্ধ; ৪. শমথ স্কন্ধ; ৫. ক্ষুদ্রবস্তু স্কন্ধ; ৬. শয়নাসন স্কন্ধ; ৭. সংঘভেদক স্কন্ধ; ৮. ব্রত স্কন্ধ; ৯. প্রাতিমোক্ষ স্কন্ধ; ১০. ভিক্ষুণী স্কন্ধ; ১১. পঞ্চশতিকা স্কন্ধ এবং ১২. সপ্তশতিকা স্কন্ধ।

প্রথম থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত বুদ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কী উদ্দেশ্যে যেসব বিধি বিধান প্রবর্তন করেছিলেন, সেগুলোর ঐতিহাসিক ভিত্তি আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ভিক্ষুণীসংঘ গঠনের ইতিহাস, ভিক্ষুণীদের নিয়ম-কানুন এবং বুদ্ধ কী কী শর্তে ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কিত বর্ণনাও এতে রয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির বিবরণ ধারাবাহিকভাবে চুল্লবগ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ এ দুটি শুধু অনুশাসনমূলক গ্রন্থ নয়, তথাগত বুদ্ধের সমকালীন বিবিধ ইতিহাসের আকর গ্রন্থ হিসেবেও এগুলোর অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে।

৩. পরিবার পাঠ

এটি বিনয় পিটকের শেষ গ্রন্থ। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের আচরণ বিধি সম্পর্কিত বিষয়াবলি এ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। বিনয়ের জটিল এবং দুর্বোধ্য অনেক বিষয় প্রশ্নোত্তরে সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ ভাষায় এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এতে প্রবর্তিত বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নতুন শিক্ষানবিশ ভিক্ষুদের বিনয় শিক্ষার উপকরণ হিসেবে এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। এ গ্রন্থে ছোট-বড় সব মিলে সর্বমোট ২১টি অধ্যায় আছে। এগুলো গদ্যে ও পদ্যে রচিত। প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকতার আলোকে বিনয় বিধির বিভিন্ন ছবি শিক্ষাপদের ব্যাখ্যা যুক্ত হয়েছে। বিনয় পিটকের অন্য গ্রন্থগুলোর চেয়ে পরিবার পাঠ গ্রন্থটি অনেক সহজবোধ্য। এটিকে বিনয় পিটকের সারবস্তু বলা হয়।

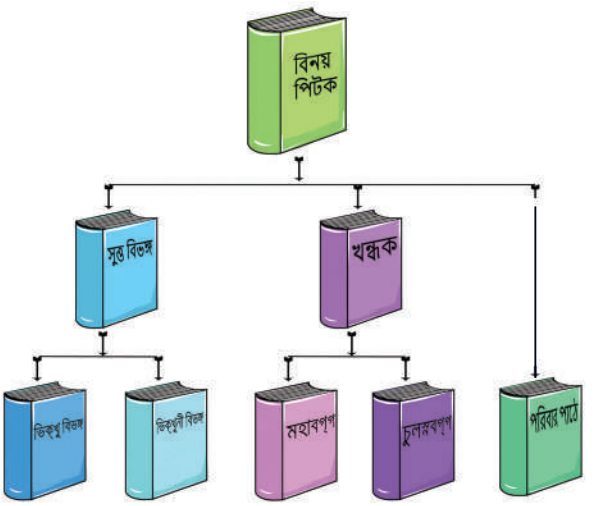

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১২

বাড়িতে বিনয় পিটকের বাংলা অনুবাদ থাকলে তোমরা একটু চোখ বুলিয়ে আসতে পারো । এছাড়া নিচের লিংক বা QR code থেকে বিনয়পিটকের বাংলা অনুবাদ পেয়ে যাবে।

লিংক -

http://banavantey.blogspot.com/2014/03/blog-post.html

QR code -

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৩

বিনয়পিটক বিষয়ে একটি কনসেপ্ট ম্যাপিং কর।

কনসেপ্ট ম্যাপিং এ বিনয়পিটকের ভাগ, পুস্তকসমূহের সংখ্যা ও নাম এবং প্রত্যেকটি পুস্তকে নির্দেশিত একটি করে শিক্ষণীয় উপদেশ লিখ ছকাকারে লেখ

কনসেপ্ট ম্যাপিং ছক

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

বিনয় পিটকের গুরুত্ব

জীবজগতের প্রত্যেকটি বিষয়ের স্বতন্ত্র নীতি আছে। আকাশে রাতে চাঁদ এবং দিনে সূর্য- এটি প্রকৃতির নিয়ম। কোন বৃক্ষ কত বছরে ফল দেবে সেটি বৃক্ষের নিয়ম। এ নিয়মের ব্যত্যয় হলেই উদ্ভব হয় সমস্যার। তথাগত বুদ্ধ তাঁর কার্য-কারণ তত্ত্বে বলেছেন, প্রত্যেকের আজকের কর্মই তার ভবিষ্যতের ফল। অর্থাৎ, যে যেরকম কাজ করবে, সে অনুযায়ী ফল ভোগ করবে। সুতরাং নিজের ভবিষ্যতকে দুঃখ ও কষ্টমুক্ত করতে হলে আমার আজকের কর্ম হতে হবে নীতিসম্পন্ন ও আদর্শিক। এই নীতি আদর্শ হঠাৎ করে আচরণ সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন চর্চা। কিন্তু কোনো বিধিবদ্ধ বা বাধ্যবাধকতার সাথে সম্পৃক্ত না হলে চর্চা দীর্ঘস্থায়ী করা কঠিন হয়। তথাগত বুদ্ধ সর্বসত্তার কল্যাণের জন্য তাঁর মঙ্গলবাণী প্রচার করলেও তিনি বিধিবদ্ধ নীতিমালা সকলের জন্য করেননি। শুধু ভিক্ষু-শ্রামণদের জন্য প্রবর্তন করেছেন নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ বিনয় শিক্ষা। যা ত্রিপিটকের বিনয় পিটকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বিনয় নীতি অনুশীলনের কারণে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ সর্বদা সৌম্য, শান্ত ও মৈত্রীপরায়ণ হয়।

বিনয় পিটকের নির্দেশনা প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য আবশ্যিক পালনীয় রীতি। এর কারণেই ভিক্ষুসংঘে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মৈত্রীবোধ অটুট থাকে। এতে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধও বৃদ্ধি পায়। চিত্তে শান্তি বিরাজ করে। নীতি অনুশীলনকারী ব্যক্তি কর্মে যেমন নীতিবান হয়, তেমনি তাঁর অন্তর হতে হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয়। এতে চিত্তের বিতর্ক ও দ্বন্দ্বভাবও দূর হয়।

তথাগত বুদ্ধ বিনয় পিটকে বিধি-বিধান গুলো এমন ভাবে বিন্যাস করেছেন যে এগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে শুধু আচরণগত উন্নয়ন নয়, অন্তর্হগৎও মৈত্রী, করুণায় স্নাত হবে। আমাদের সকল দ্বন্দ্বের মূল-তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণার কারণেই হিংসা ও অহংভাবের উদয়। যার জন্য সত্য ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা যায় না। এমনকি চিরসত্য অনিত্যকেও বুঝতে পারিনা। তাই, বুদ্ধ বিনয় নীতিকে এমনভাবে বর্ননা করেছেন যে এই বিধিবদ্ধ বিনয় যথার্থ অনুসরণ করলেই মানুষ নিজেকে অমূল্য সম্পদে পরিণত করতে পারবেন। সেই সাথে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজিত হবে। জগত হবে প্রশান্তিময়। তাই বিনয় পিটকের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথাগত বুদ্ধ এই বিনয় পিটক বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের জন্য প্রবর্তন করলেও সাধারণ মানুষের এতে অনেক কিছু শেখার আছে। এই শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমরা যত বেশি উপলব্ধি করতে সমর্থ হবো, ততই আমাদের মঙ্গল। সমাজ ও দেশের জন্য হবে মঙ্গলময়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৪

তোমার জীবনে বিনয় পিটকের উপদেশ কীভাবে পালন করবে তার একটি পরিকল্পনা করো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৫

তুমি কীভাবে তোমার পরিবারে সদস্য/সহপাঠীদের তাদের জীবনে বিনয় পিটকের উপদেশ পালন করতে সহায়তা/উদ্বুদ্ধ করবে তার একটি পরিকল্পনা করো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৬

পরিকল্পনা তৈরির অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতা সমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

বন্দনা

এ অধ্যায় শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব–

১. বন্দনা কী;

২. ত্রিরত্ন বন্দনার নিয়মাবলি;

৩. ত্রিরত্ন বন্দনার গুণ ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি;

৪. সাত মহাস্থান বন্দনা;

৫. বোধি বন্দনা;

৬. বন্দনার গুরুত্ব বা প্রভাব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৭

চলো সবাই মিলে তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী একটি ধর্মীয় গান/কীর্তন/বন্দনা করি। কোন ধর্মীয় গান/কীর্তন/বন্দনাটি করব তা নিচে লিখি ফেলি।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৮

ধর্মীয় গান/বন্দনা কীর্তনের সারমর্ম লিখি

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

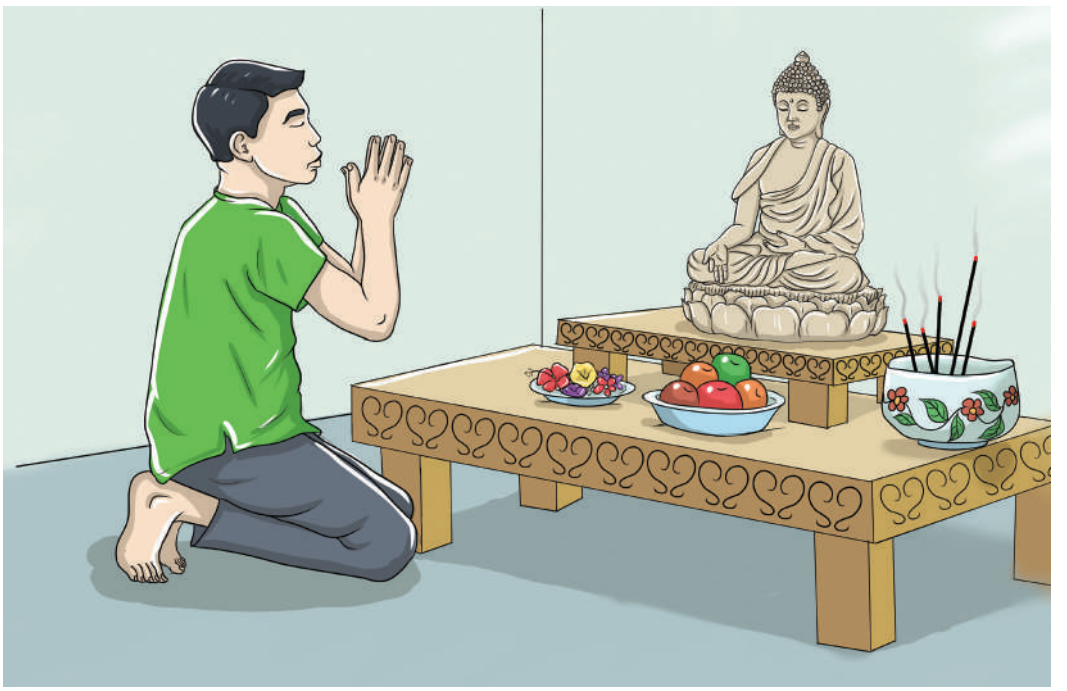

বুদ্ধ বন্দনা

বন্দনা

বৌদ্ধদের ধর্মচর্চায় বন্দনার প্রয়োজনীয়তা অনেক। বন্দনা শব্দের অনেক আভিধানিক অর্থ হলো প্রণাম, প্রণতি, অভিবাদন, সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, নমস্কার, পূজা ইত্যাদি। বৌদ্ধরা প্রতিদিন বিহারে এবং নিজ গৃহে বুদ্ধ প্রতিবিম্বের সামনে বন্দনা নিবেদন করেন। বৌদ্ধধর্মে নানা রকমের বন্দনা রয়েছে। যেমন– ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ-বন্দনা, পিতৃ বন্দনা, বোধিবৃক্ষ বন্দনা, সপ্তমহাস্থান বন্দনা প্রভৃতি। বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের গুণরাশিকে স্মরণ করে যে বন্দনা করা হয়, তাকেবলে ত্রিরত্ন বন্দনা। বন্দনা করার প্রধান উদ্দেশ্য– মনের পবিত্রতা সৃষ্টি করা, শ্রদ্ধা নিবেদন করা, অশান্ত মন শান্ত করা এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। একইসঙ্গে বন্দনার মাধ্যমে ত্রিরত্নের গুণরাশিকে অন্তরে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি বন্দনা ও বন্দনার নিময় সম্পর্কে জানব।

ত্রিরত্ন বন্দনার নিয়ম

বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। বন্দনা বিহারে এবং বাড়িতে বুদ্ধমূর্তি বা ছবির সামনে করা যায়। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা– দুই বেলা বন্দনা করা ভালো। বন্দনা করার আগে ভালো করে মুখ-হাত ধুয়ে প্রয়োজনবোধে স্নানও করে নিতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে হয়। মনকে শান্ত করে সমাহিত চিত্তে এবং হাঁটু ভাঁজ করে করজোড়ে বসে বন্দনা করতে হয়।

ত্রিরত্ন বন্দনা (পালি)

বুদ্ধং বন্দামি
ধম্মং বন্দামি
সংঘং বন্দামি
অহং বন্দামি সব্বদা।
দুতিযম্পি বুদ্ধং বন্দামি
দুতিযম্পি ধম্মং বন্দামি
দুতিযম্পি সংঘং বন্দামি
অহং বন্দামি সব্বদা।
ততিযম্পি বুদ্ধং বন্দামি
ততিযম্পি ধম্মং বন্দামি
ততিযম্পি সংঘং বন্দামি
অহং বন্দামি সব্বদা।

ত্রিরত্ন বন্দনা (বাংলা)

আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি
আমি ধর্মকে বন্দনা করছি
আমি সংঘকে বন্দনা করছি
আমি সর্বদা বন্দনা করছি

দ্বিতীয়বার আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি
দ্বিতীয়বার আমি ধর্মকে বন্দনা করছি
দ্বিতীয়বার আমি সংঘকে বন্দনা করছি
আমি সর্বদা বন্দনা করছি
তৃতীয়বার আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি
তৃতীয়বার আমি ধর্মকে বন্দনা করছি
তৃতীয়বার আমি সংঘকে বন্দনা করছি
আমি সর্বদা বন্দনা করছি

বুদ্ধের নয় গুণ বন্দনা (পালি):

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগত, লোকবিদূ, অনুত্তরো, পুরিসদম্মা সারথি, সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি।

বুদ্ধং জীবিতং পরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

যে চ বুদ্ধা অতীতা চ যে চ বুদ্ধা অনাগতা,

পচ্চুপ্পন্না চ যে বুদ্ধা অহং বন্দামি সব্বদা।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং,

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গলং।

উত্তমঙ্গোন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং।

বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মমং।

বুদ্ধের নয় গুণ (বাংলা):

ইনি সেই ভগবান, যিনি অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন, সুগত বা সুপথ অনুগমনকারী, লোকবিদ, অদম্য পুরুষ দমনকারী সর্বশ্রেষ্ঠ সারথি, দেব এবং মানুষের শিক্ষক, বুদ্ধ এবং ভগবান নামে অভিহিত।

আমি আজীবন বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।

অতীত, অনাগত এবং বর্তমান বুদ্ধগণকে আমি সর্বদা বন্দনা করি।

বুদ্ধের শরণ ব্যতীত আমার আর অন্য কোনো শরণ নেই। এ সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয়মঙ্গল হোক। উত্তম অঙ্গ দ্বারা বুদ্ধের পবিত্র পাদমূলে বন্দনা করছি। আমি যদি না বুঝে বুদ্ধের প্রতি কোনো রকম দোষ করে থাকি, হে বুদ্ধ আমায় ক্ষমা করুন।

ধর্মের ছয় গুণ বন্দনা (পালি):

স্বাক্খাতো ভগবতো ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনযিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহীতি।

ধম্মং জীবিতং পরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

যে চ ধম্মা অতীতা চ, যে চ ধম্মা অনাগতা,

পচ্চুপ্পন্না চ যে ধম্মা, অহং বন্দামি সব্বদা।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, ধম্মো মে সরণং বরং,

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গলং।

উত্তমঞ্জোন বন্দেহং, ধম্মঞ্চ তিবিধং বরং।

ধম্মে যো খলিতো দোসো, ধম্মো খমতু তং মমং।

ধর্মের ছয় গুণ বন্দনা (বাংলা):

ভগবানের ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, নিজে দেখার যোগ্য, কালাকালবিহীন, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

আমি সারা জীবন ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।

অতীত, অনাগত এবং বর্তমান ধর্মসমূহকে আমি সর্বদা বন্দনা করি।

ধর্মের শরণ ব্যতীত আমার আর অন্য কোনো শরণ নেই। এ সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয় হোক এবং মঙ্গল হোক।

আমি উত্তম অঙ্গ দ্বারা ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ ধর্মকে (পরিয়ত্তি, প্রতিপত্তি ও প্রতিভেদ) অবনত মস্তকে বন্দনা করছি। আমি যদি না বুঝে কোনো দোষ করে থাকি, হে ধর্ম আমায় ক্ষমা করুন।

সঙ্ঘের নয় গুণ (পালি):

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠপুরিসপুগ্গলা এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, আহুনেয্যো, পাহুনেয্যো, দক্খিনেয্যো, অঞ্জলিকরণীয্যো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা'তি।

সঙ্ঘং জীবিতং পরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

যে চ সঙ্ঘা অতীতা চ, যে চ সঙ্ঘা অনাগতা,

পচ্চুপ্পন্না চ যে সঙ্ঘা, অহং বন্দামি সব্বদা।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, সঙ্ঘো মে সরণং বরং,

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গলং।

উত্তমঞ্জোন বন্দেহং, সঙ্ঘঞ্চ দ্বিবিধুত্তমং,

সঙ্ঘে যো খলিতো দোসো, সঙ্ঘো খমতু তং মমং।

সঙ্ঘের নয় গুণ (বাংলা)

ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, সহজ-সরল পথ প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন (উত্তম পথ কিংবা উপযুক্ত পথ)। ভগবানের শ্রাবক চার যুগল (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ) এবং পুদ্গল দুই প্রকার (মার্গ ও ফল ভেদে) এ আট প্রকার পুদ্গল। ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ আহ্বান যোগ্য, সৎকার যোগ্য, উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা পূজার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে করজোড়ে বন্দনার যোগ্য এবং লোকজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

আমি আজীবন সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।

অতীত, অনাগত এবং বর্তমান সঙ্ঘকে আমি সর্বদা বন্দনা করি।

সঙ্ঘের শরণ ব্যতীত আমার আর অন্য কোনো শরণ নেই। এ সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয়মঙ্গল হোক।

আমি উত্তম অঙ্গ দ্বারা দ্বিবিধ (সম্মতি ও আর্যসংঘ) শ্রেষ্ঠ সঙ্ঘকে বন্দনা করছি। আমি যদি না বুঝে কোনো দোষ করে থাকি, হে সঙ্ঘ আমায় ক্ষমা করুন।

আহার বন্দনা (পালি):

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং,

অনুকম্পং উপাদায় পতিগণহাতু মুত্তমং।

বাংলা: প্রভু ভগবান আপনার জন্য সুসজ্জিত উত্তম খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পূজা করেছি। অনুগ্রহ করে আপনি এই পূজিত খাদ্যদ্রব্য সাদরে গ্রহণ করুন।

প্রদীপ বন্দনা (পালি): ঘনসারপ্পদীত্তেন দীপেন তমধংসিনা,
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজযামি তমোনুদং।

বাংলা: ঘনসার তৈলযুক্ত বস্তু দ্বারা অথবা অন্ধকারকে আলোকরশ্মি বিনাশপ্রাপ্ত জ্বলন্ত প্রদীপ দ্বারা ত্রিলোক প্রদীপস্বরূপ ভগবান সম্বুদ্ধকে পূজা করছি।

ধূপ বন্দনা (পালি): গন্ধ-সম্ভার যুত্তেন ধুপেনাহং সুগন্ধি না,
পূজয়ে পূজন্যেন্তং পূজা ভাজনং মুত্তমং।

বাংলা: গন্ধ সম্ভারযুক্ত এই সুগন্ধিপ্রাপ্ত ধূপের দ্বারা আমি সেই পূজনীয় উত্তম পূজ্য ভগবানকে পূজা করছি।

সপ্ত মহাস্থান পরিচিতি:

বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করার পর বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে সাত দিন করে ঊনপঞ্চাশ দিন সেখানে অবস্থান করেন। কোনো সময় ধ্যানাবস্থায়, কোনো সময় চংক্রমণ অবস্থায়, আবার কোনো সময় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিমুক্তি সুখ অনুভব করেছেন। এই সাতটি স্থান সাত মহাস্থান নামে খ্যাত সেই সাতটি তীর্থস্থান দর্শন করার জন্য প্রতিবছর বৌদ্ধরা বুদ্ধগয়ায় যায়। নিচে তীর্থস্থানগুলোর বন্দনা পালি ও বাংলাসহ দেওয়া হলো:

পালি: পঠমং বোধিপলঙ্খং, দুতিযং অনিমিসম্পি চ,ততিযং চঙ্কমণংসেট্ঠং, চতুত্থং রতনঘরং, পঞ্চমং অজপালঞ্চ, মুচলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং, সত্তমং রাজাযতনং, বন্দে তং বোধিপাদপং।

বাংলা: প্রথম বোধিপালঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ, তৃতীয় চংক্রমণ, চতুর্থ রতনঘর, পঞ্চম অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, ষষ্ঠ মুচলিন্দ, সপ্তম রাজায়তনসহ এই সাতটি স্থানকে বোধিবৃক্ষের সামনে অবনত শিরে বন্দনা করছি।

বোধিপালঙ্ক স্থান: তথাগত বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নিচে যে আসনে বসে কঠোর ধ্যান করেছিলেন, সে আসনকে বলা হয় বজ্রাসন বা বোধিপালঙ্ক।

অনিমেষ স্থান: বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধ সাতদিন ধরে বোধিবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে একপলকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এটি বজ্রাসন হতে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত এবং অনিমেষ চৈত্য নামে পরিচিত।

চংক্রমণ স্থান: বোধিপালঙ্ক ও অনিমেষ চৈত্য স্থানের মাঝামাঝি এটির অবস্থান। এখানে বুদ্ধ সব সময় চংক্রমণ করতেন। তাই স্থানটি চংক্রমণ নামে খ্যাত।

রতনঘর স্থান: বোধিপালঙ্কের উত্তর-পশ্চিম পাশের একটু দূরে রতনঘর স্থানটি অবস্থিত। বুদ্ধ ধ্যান করার জন্য এই ঘরে অবস্থান করতেন।

অজপাল ন্যাগ্রোধ স্থান: এটি বোধিপালঙ্কের পূর্ব দিকে এবং অনিমেষ চৈত্যের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। স্থানটি ছিল ছাগল পালকদের বিচরণক্ষেত্র। বুদ্ধ এখানেও কোনো কোনো সময় বসে ধ্যান করতেন।

মুচলিন্দ স্থান: বোধিপালঙ্কের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত স্থানের নাম মুচলিন্দ। নাগরাজার বিচরণ ক্ষেত্র ছিল বিধায় এটি মুচলিন্দ রাজার আবাসস্থল হিসাবে খ্যাত। বুদ্ধের ধ্যানের সময় নাগরাজ বিভিন্নভাবে উপদ্রব থেকে রক্ষা করেছিলেন বলে জানা যায়।

রাজায়তন স্থান: বোধিপালঙ্কের কিছু দূরে দক্ষিণ-পূর্বে এবং মুচলিন্দ হ্রদ পাশে এটির অবস্থান। বুদ্ধ এখানে ধ্যান করতেন এবং বিমুক্তি সুখ অনুভব করতেন।

বোধি বন্দনা: যস্সমূলে নিসিন্নো'ব সব্বারি বিজযংঅকা, পত্তো সব্বঞ্ঞুতং সখা বন্দেতং বোধিপাদপং, ইমে

হেতে মহাবোধি লোকনাথেন পূজিতং, অহম্পি তে নমস্সামি বোধিরাজ নমত্থুমে।

বাংলা: সর্বজ্ঞ ভগবান নামে যিনি খ্যাত সেই তথাগত বুদ্ধ মহাবোধি বৃক্ষকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, আমিও সেই বোধিরাজকে পূজা করছি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৯

ত্রিরত্ন বন্দনাটিতে কিছু নতুন শব্দ পাবে। সেসব নতুন শব্দ খুঁজে বের করো এবং অর্থ বের করে লেখো। বিভিন্ন উৎস থেকে সেগুলোর অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করো অথবা প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নাও।

নতুন শব্দ	অর্থ

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২০

ত্রিরত্ন বন্দনার মূলভাব নিজের ভাষায় লেখো।

মূলভাব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

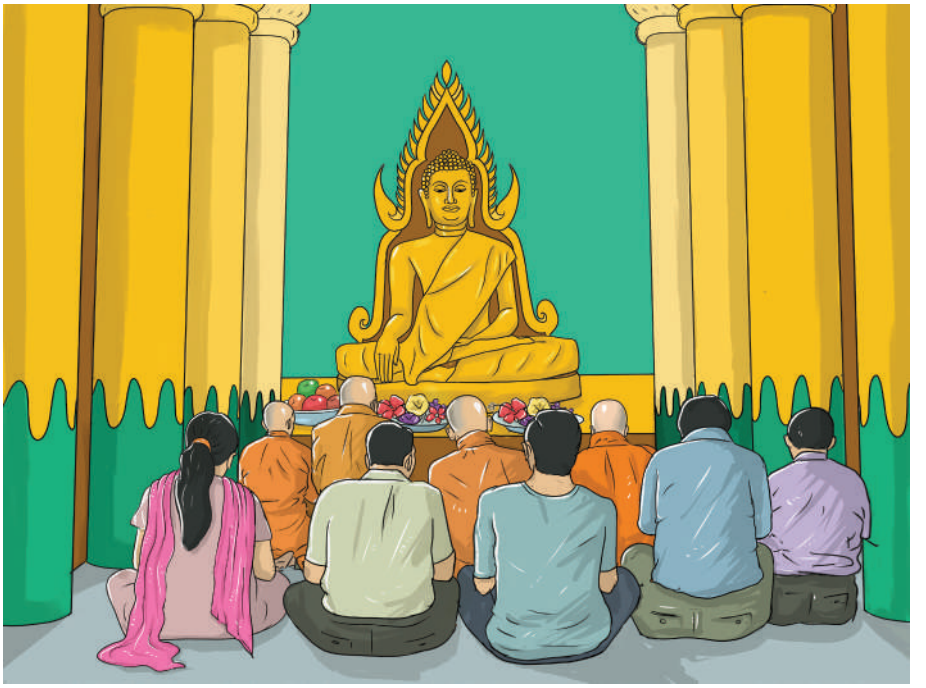

সমবেত বুদ্ধ বন্দনা

বন্দনার গুরুত্ব

মানুষের জীবনে বন্দনার প্রভাব অসীম। বন্দনার অনেক সুফল আছে। বন্দনা করার মাধ্যমে মন পবিত্র হয়, পুণ্য লাভ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। একইসঙ্গে মানবিক গুণ বিকশিত হয়। মানুষ অকুশল কর্ম থেকে দূরে থাকে এবং সদাচরণে উৎসাহিত হয়। বন্দনার মাধ্যমে মন শান্ত থাকে, ধৈর্য বাড়ে, স্মৃতিশক্তি প্রখর হয় এবং নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করা যায়। নিয়মিত বন্দনা করলে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের মনোভাব সুদৃঢ় হয়। বন্দনার মাধ্যমে লোভ-দ্বেষ-মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২১

ত্রিরত্ন বন্দনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর সাত দিনের জন্য নিচের কার্যক্রম ছকটি পূরণ করি।

১ম দিন

ত্রিরত্ন বন্দনা কোথায় করি	ত্রিরত্ন বন্দনা কখন করি	ত্রিরত্ন বন্দনা কার সাথে করি?
বিদ্যালয়ে	ভোর সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা রাত গভীর রাত	সহপাঠী শিক্ষক উপরের নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থী। ....

বাড়িতে	ভোর সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা রাত গভীর রাত	মা-বাবা ভাই-বোন দাদা-দাদি ....
খেলার মাঠে	ভোর সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা রাত গভীর রাত	প্রতিবেশী বন্ধু খেলার সাথী ....
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে	ভোর সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা রাত গভীর রাত	এলাকার মানুষজন ভিক্ষু আত্মীয়স্বজন ....
পারিবারিক অনুষ্ঠানে	ভোর সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা রাত গভীর রাত	আত্মীয়স্বজন ....
বিয়ে/জন্মদিন বা যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে	ভোর সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা রাত গভীর রাত	আত্মীয়স্বজন এলাকার মানুষজন বন্ধু ....

বাকি দিনগুলোর কার্যক্রম পত্র নিজে বানিয়ে নাও অথবা শিক্ষক থেকে নিয়ে নাও। কার্যক্রম পত্রটি বই এর পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২২

কার্যক্রম ছক তৈরির অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

ধর্মীয় উৎসবঃ কঠিন চীবর দান

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

১. কঠিন চীবর দান কী;

২. কঠিন চীবর দান প্রবর্তনের পটভূমি;

৩. কঠিন চীবর দানের নিয়মাবলি;

৪. কঠিন চীবর দানের সুফল;

৫. কঠিন চীবর দানের সামাজিক গুরুত্ব ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৩

আমরা সবাই মিলে একটি ফিল্ড ট্রিপে যাব। ফিল্ডট্রিপে যাওয়ার জন্য যা যা প্রস্তুতি নিতে হয় অথবা নির্দেশনা মেনে চলতে হবে, তা শিক্ষক থেকে জেনে নিয়ে নোট করে রাখো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিল্ড ট্রিপে যাওয়া সম্ভব না হলে আমরা অন্য কোনো বিকল্প অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৪

তোমার ফিল্ডট্রিপের/বিকল্প অভিজ্ঞতাটি লেখো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

কঠিন চীবর দান

কঠিন চীবর দান কী

কঠিন চীবর দান বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। বৌদ্ধ বিশ্বে শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যান্ড, ভারত ও বাংলাদেশসহ থেরোবাদী বৌদ্ধদেশসমুহে অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে এই উৎসব প্রতিবছর উদ্‌যাপন করা হয়। কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্য করে প্রতিটি গ্রামের বৌদ্ধ বিহারে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়।

'কঠিন চীবর' শব্দটি 'কঠিন' ও 'চীবর' দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত। এখানে চীবর হলো ভিক্ষুদের পরার কাপড় যার কয়েকটি অংশ রয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে চীবরকে পরিশুদ্ধ করতে হয় বলে একে কঠিন চীবর নাম দেওয়া হয়েছে। তাই উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ চীবর দান করলেও তা কঠিন হয় না। ভিক্ষুসংঘ 'কর্মবাচা' নামের একটি সূত্র পাঠের মাধ্যমে ধর্মীয় রীতিতে চীবরকে কঠিন চীবরে পরিণত করেন। কর্মবাচা পাঠ শেষে কঠিন চীবর বিহারের অধ্যক্ষ ভিক্ষুকে দেওয়া হয়। কঠিন চীবর গ্রহণকারী ভিক্ষু ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই চীবর নিজের সঙ্গে রাখেন।

প্রতিবছর ভিক্ষুদের বর্ষাব্রত শেষে প্রবারণা পূর্ণিমার পর থেকে অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমার পরের দিন থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাসের মধ্যে কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপন করতে হয়। অন্য সময়ে এ উৎসব উদ্‌যাপনের বিধান নেই। প্রত্যেক বৌদ্ধ বিহারে বছরে একবারই কঠিন চীবর দান করা যায়। তবে যে বিহারে কোনো ভিক্ষু বর্ষাব্রত যাপন করেন না, সেই বিহারে কঠিন চীবর দান করা যায় না। কোনো ভিক্ষু বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান করতে না পারলে তিনি কঠিন চীবর গ্রহণ করতে পারেন না। কেবল বর্ষাব্রত যাপনকারী ভিক্ষুই কঠিন চীবর গ্রহণ করতে পারেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রধানত তিন অংশযুক্ত চীবর ব্যবহার করেন। সেগুলো হল ১. উত্তরাসঙ্গ বা একাজিক বহির্বাস, ২. সংঘাটি বা দোয়াজিক; ও ৩. অন্তর্বাস বা পরিধেয় বস্ত্র। এ তিনটি চীবরের মধ্য হতে যে কোনো একটি দিয়ে বর্ষাবাস পালনকারী ভিক্ষুর উদ্দেশে সংঘকে চীবর দান করা যায়।

কঠিন চীবর দান প্রবর্তনের পটভূমি

তখন ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিক বিহারে বসবাস করছিলেন। ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পাঠেয়বাসী (পশ্চিম দেশীয়) ত্রিশ জন ভিক্ষু শ্রাবস্তীর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন অরণ্যবাসী। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে তাঁরা জীবনধারণ করেন। তাঁরা পাংশুকুলিক চীবর ও ত্রিচীবরধারী। যাওয়ার পথে ছয় যোজন দূরে থাকতে বর্ষা শুরু হয়ে গেল। তখন অন্য কোনো উপায় না থাকায় পথিমধ্যে সাকেত নগরীতে তাঁদের বর্ষাবাস শুরু করতে হয়েছিল।

বর্ষাব্রত শেষ হওয়ার পরপরই সেই পাঠেয়বাসী ত্রিশজন ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য শ্রাবস্তীতে রওনা হলেন। জেতবন বিহারে উপস্থিত হয়ে তাঁরা ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

তিন মাস বর্ষাবাস শেষে প্রবারণা সম্পন্ন করে দীর্ঘ পথ হেঁটে কাদা পেরিয়ে ভেজা ও জীর্ণশীর্ণ চীবরে ভিক্ষুরা বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভিক্ষুদের জীর্ণশীর্ণ চীবর দেখে ভগবান বুদ্ধ কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানের অনুজ্ঞা (নির্দেশ) দিয়েছিলেন। বুদ্ধের এই অনুজ্ঞার পর থেকে প্রতিবছর বর্ষাব্রত শেষে প্রবারণার পর থেকে এক মাসব্যাপী কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানের প্রচলন শুরু হয়। উল্লেখ্য, বুদ্ধের আমলে ভিক্ষুরা বিভিন্ন জায়গা যেমন শ্মশান ও আবর্জনা স্তূপ থেকে ছেঁড়া কাপড় সংগ্রহ করে সেগুলো সেলাই করে চীবর বানাতেন। সেই আমলে তাঁরা সাধারণ গৃহীদের কাছ থেকে চীবর গ্রহণ করতেন না। ভিক্ষুদের ছেঁড়া কাপড় সংগ্রহ করে চীবর সেলাই করা খুবই কঠিন ছিল। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে চীবর দানের অনুমতি দিয়েছিলেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৫

কঠিন চীবর দান সম্পর্কিত অনেক গান রয়েছে। তোমরা তোমাদের পছন্দমতো একটি গাইতে পারো। নিচে একটি গানের লিংক এবং কিউ আর কোড দেওয়া আছে।

চলো সবাই মিলে একটি গান গাই।

https://www.youtube.com/watch?v=RXJTj3t-WRg

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৬

কঠিন চীবর দান সম্পর্কিত যে গানটি শুনেছ, তার বাণী লিখে ফেলো।

গানের নাম:

শিল্পীর নাম:

গীতিকারের নাম:

সুরকারের নাম:

গানের বাণী/কথা

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

পাহাড়ি নারীদের চীবর বুনন

কঠিন চীবর দানের নিয়মাবলি

বিনয় অনুসারে কঠিন চীবর দান চারটি পদ্ধতিতে করা যায়।

প্রথম: যেদিন কঠিন চীবর দান করা হবে, সেই দিনের সূর্যোদয় থেকে পরের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে হয়। এ সময়ের মধ্যে সুতা কাটা থেকে শুরু করে কাপড় বোনা, সেলাই করা এবং রং করে চীবর তৈরির যাবতীয় কাজ শেষ করে তা দান করতে হয়।

দ্বিতীয়: ভালো মানের সাদা কাপড় দিয়ে চীবর সেলাই ও রং করে দান দেওয়া যায়।

তৃতীয়: আগে তৈরি করা চীবর দিয়েও কঠিন চীবর দান দেওয়া যায়।

চতুর্থ: সেলাই না করেও শুধু সাদা কাপড় কঠিন চীবরের মতো দান করা যায়। তবে সেই সাদা বস্ত্রটি চীবরে পরিণত করতে হলে পরের দিনের সূর্যোদয়ের আগেই সেলাই ও রং করে কঠিন চীবরে পরিণত করতে হবে।

ভিক্ষু, শ্রামণ, দায়ক-দায়িকা ও উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে যে কেউ কঠিন চীবর দান করতে পারেন। কঠিন চীবর দানের দিনে প্রতিটি বিহারে প্রচুর ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকা উপস্থিত হন। তাঁরা ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করে ত্রিরত্ন বন্দনা ও বুদ্ধপূজা ইত্যাদি সম্পন্ন করে উপস্থিত পূজনীয় ভিক্ষু সংঘকে উদ্দেশ্য করে কঠিন চীবর দান দিয়ে থাকেন। কঠিন চীবর দানের সময় তাঁরা এই উৎসর্গ মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন:

'ইমং কঠিন চীবরং ভিক্খু সংঘস্স দেম কঠিনং অত্থরিতুং।' (৩ বার)

এই কথার অর্থ হলো- এই কঠিন চীবর ভিক্ষুসংঘকে কঠিনে আস্তীর্ণ করার জন্য দান করছি।

চীবরকে কঠিনে পরিণত করতে হলে কঠিন চীবর গ্রহণকারী ভিক্ষুসহ কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়। চীবর গ্রহণের পর তা ভিক্ষু সীমায় (বিহারের পাশে স্থাপিত বিশেষ স্থান) নিয়ে গিয়ে যে ভিক্ষু চীবর গ্রহণ করবেন, সে ভিক্ষুর নাম উল্লেখ করে ভিক্ষুরা কর্মবাচা পাঠ করে তাঁকে চীবর প্রদান করেন। যে বিহারে

ভিক্ষু সীমা নেই, সে ক্ষেত্রে বিহারের উদকসীমা বা বুদ্ধাসনের সামনে বসে ভিক্ষুরা বিনয় অনুসারে দানপ্রক্রিয়া সম্পাদন করেন। যেদিন যে বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হয়, সেদিন অনেক ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে সেই বিহারে যতজন ভিক্ষু উপস্থিত থাকেন, প্রত্যেকে চীবরদানের পুণ্য লাভ করেন।

কঠিন চীবর দানের দিনে শুধু চীবর নয়, সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকারা ভিক্ষুসংঘের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তুও দান করে থাকেন। এসব দানীয় বস্তুও কঠিন চীবর দানের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। এতেও কঠিন চীবর দানের মতো পুণ্য হয়। সে কারণে শ্রদ্ধাচিত্তে কঠিন চীবর দান দেওয়া উত্তম কাজ।

কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে উপাসক-উপাসিকাদের শোভাযাত্রা

কঠিন চীবর দানের সুফল

কঠিন চীবর দানের সুফল অনেক বেশি। ভগবান বুদ্ধ ছয় অভিজ্ঞাসম্পন্ন পাঁচ শ ভিক্ষুকে নিয়ে হিমালয়ের অনোমতপ্ত হ্রদে গিয়ে কঠিন চীবরদানের সুফল বর্ণনা করেছিলেন। বুদ্ধ প্রথমে নাগিত স্থবিরকে কঠিন চীবর দানের সুফল বর্ণনা করতে বলেছিলেন। নাগিত স্থবির বলেছিলেন:

‘কঠিন দানং দাত্বন সংঘে গুণ বরুত্তমে

ইতো তিংসে মহাকপ্পে নাভি জানামিদুগ্গাতিং।’

অনুবাদ: আজ থেকে ত্রিশকল্প পূর্বে অর্থাৎ শিখি বুদ্ধের সময়ে গুণোত্তম সংঘকে কঠিন চীবর দান করে কোনোদিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করিনি।

নাগিত স্থবিরের বর্ণনা মতে, কঠিন চীবর দানের ফলে তিনি আঠার কল্প দেবলোকে দিব্যসুখ উপভোগ করেন; চৌত্রিশবার স্বর্গের ইন্দ্ররূপে জন্মলাভ করে দেবলোক শাসন করেন; মাঝেমধ্যে রাজ চক্রবর্তীর সুখ লাভ করেন। তিনি যেখানে জন্ম নিয়েছিলেন, সব সময় সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর কখনো ভোগ সম্পদের অভাব হয়নি। হাজারবার ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা হয়েছিলেন। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করলে বরাবরই মহাবিত্তশালী ধনীর গৃহে জন্মলাভ করেছিলেন।

নাগিত স্থবিরের পর বুদ্ধ নিজেই কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, অন্যান্য দানীয়বস্তু এক শ বছর দান করলেও একটা কঠিন চীবর দানজনিত পুণ্যের ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না। সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান স্বর্গের মতো রত্নখচিত চুরাশি হাজার সুরম্য বিহার নির্মাণ করে দান করলেও কঠিন চীবর দানের ষোলো ভাগের এক ভাগ হয় না। সম্যক সম্বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ এবং বুদ্ধের মহাশ্রাবকগণ সবাই কঠিন চীবর দানের ফল লাভ করে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এ ছাড়া ত্রিপিটকে বলা আছে কঠিন চীবর গ্রহণকারী ভিক্ষুগণ ও দায়ক-দায়িকারাও কঠিন চীবর দানের সুফল ভোগ করতে পারেন।

কঠিন চীবরদানকারী দাতারা যে পাঁচটি ফল লাভ করতে পারেন সেগুলো হলো—

১. সকম্মাবচরে - যাবতীয় ভোগ সম্পদের অধিকারী হতে পারা;

২. ভারনিক্খেপে - চলাচলে বিপদমুক্ত থাকতে পারা;

৩. বহুবত্থিকো - বহু বস্ত্র (রেশমি, পশমি) লাভ করা;

৪. নেকা ভোজনলাভী - অর্জিত ভোগসম্পদ নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারা এবং

৫. না দিন্নোদান - লব্দ সম্পত্তি পরিপূর্ণ থাকে।

কঠিন চীবর দান বিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই দান যখন তখন করা যায় না। বছরের নির্ধারিত সময়েই করতে হয়। এদিকে সংঘদান, পুগ্গলিক দান, অষ্টপরিষ্কার দান বিনয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে যে কোনো সময় তা সম্পাদন করা যায়। এই কারণে কঠিন চীবর দান অন্য দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কঠিন চীবর দানের ফলে ভিক্ষুসংঘ ও দায়ক-দায়িকা সবারই প্রভূত পুণ্য হয়। এই পুণ্য লাভের বিবেচনায় কেউ কেউ কঠিন চীবর দানকে 'দানোত্তম' বলে অভিহিত করে থাকেন।

কঠিন চীবর দানের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

দানোত্তম কঠিন চীবর দান বৌদ্ধদের অন্যতম জাতীয় উৎসব। এই উৎসবের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অনেক। প্রতি বছর প্রবারণা শেষে এক মাসব্যাপী কঠিন চীবর দানোৎসব চলতে থাকে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে নানা আয়োজন চলে। প্রতিটি বিহারকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়। প্রত্যেক বৌদ্ধ গ্রামে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আগমন ঘটে। বিভিন্ন গ্রাম, নগর ও জনপদ হতে পুণ্যার্থীরা কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তখন ঘরে ঘরে যেন আত্মীয়স্বজনের মিলন মেলা বসে।

কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানের আয়োজন এককভাবে কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। পাড়া-প্রতিবেশী, দায়ক-দায়িকা, বিহার পরিচালনা কমিটি ও ভিক্ষুসংঘ মিলে একত্রে এই দান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। এই আয়োজন করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রত্যেকে যার যার মতামত দিতে পারেন। বিভিন্ন জনের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সবার গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থাৎ কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা চর্চার সুযোগ করে দেয়। তাছাড়া দায়ক-দায়িকা ও ভিক্ষুসংঘ যখন একত্রে মিলিত হয়, তখন ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ উন্নয়নের নানা বিষয়েও আলোচনা হয়। এতে করে সমাজ উন্নয়নে নানা উপায় বের হয়ে আসে। ভিক্ষুসংঘ ও দায়ক-দায়িকাদের মধ্যে কাজের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানের দিনে বিভিন্ন বিহার থেকে অভিজ্ঞ পন্ডিত ভিক্ষুমণ্ডলীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিন মাস বর্ষাব্রতের সময় তাঁরা ধর্ম অধ্যয়ন ও ধ্যান সাধনায় রত থাকেন। কঠিন চীবন দানের দিনে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশে বর্ষাবাস, প্রবারণা, কঠিন চীবর দান ও বৌদ্ধধর্মের দান, শীল ও ভাবনার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে কঠিন চীবর দানসভা দেবসভায় পরিণত হয়। ধর্মদেশনা ও ধর্মসভার মাধ্যমে পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ যেমন গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা প্রচারের সুযোগ পান, তেমনি ধর্ম সম্পর্কে অনেক অজানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে দায়ক-দায়িকাদেরও ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীরাও এ অনুষ্ঠানে তাঁদের কাছ থেকে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন।

কঠিন চীবরদানকে কেন্দ্র করে অনেক বিহারে সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে স্মারকগ্রন্থ ও বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো বিহারে বিহার পরিচালনা কমিটি বা বৌদ্ধ সংগঠনের উদ্যোগে মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চতর ডিগ্রি লাভ এবং সমাজসেবা ও রাষ্ট্রীয় কোনো কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিনন্দন ও সম্মাননা জানানো হয়। এ রকম উদ্যোগের মাধ্যমে নবীন প্রজন্ম উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ এবং সমাজকর্মীরা সমাজসেবা ও মানব সেবার কাজে অংশ নিতে উৎসাহ বোধ করেন।

কঠিন চীবর দান বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরিতেও সহায়তা করে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলায় জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করে থাকে। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার – কঠিন চীবর দান এই বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেয়। আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও পূজা-পার্বণে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এতে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক জানাশোনা, বোঝাপড়া ও হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

অনেক বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে সরকারের মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধিদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরাও ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের গুরুত্ব সবার কাছে তুলে ধরেন। কাজেই কঠিন চীবর দান আন্তঃসম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বজায় রাখতে অনন্য ভূমিকা রাখে।

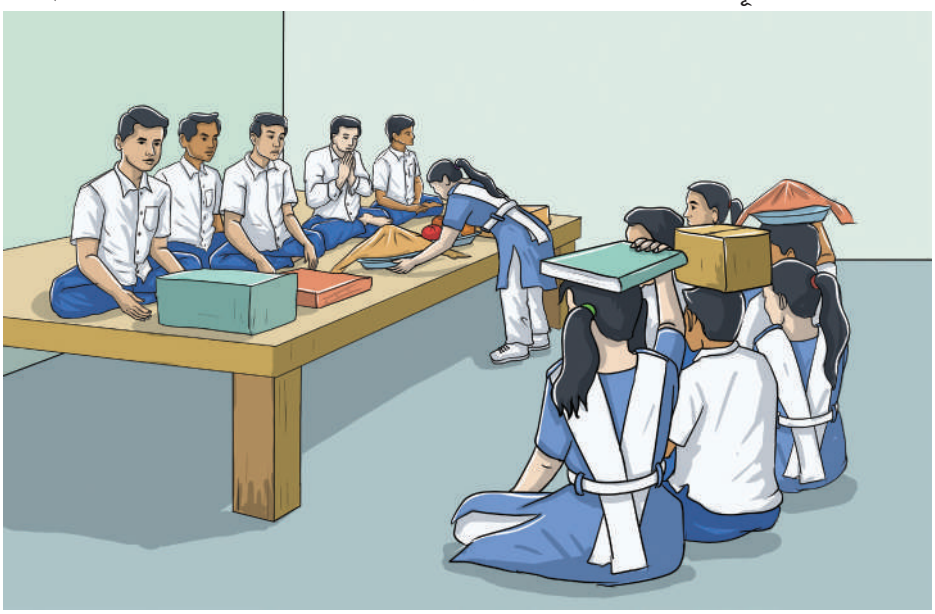

কঠিন চীবর দানের ভূমিকাভিনয়

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৭

কঠিন চীবর দান কীভাবে চর্চা/পালন করা হয় তা সহপাঠীদের সঙ্গে দলীয়ভাবে শ্রেণিকক্ষে একটি সিমুলেশনে অংশগ্রহণ করি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৮

সিমুলেশনের অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতা সমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

সূত্র ও নীতিগাথা

এ অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারব

১. সূত্র ও নীতিগাথা কী;

২. করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি;

৩. করণীয় মৈত্রী সূত্র;

৪. নিধিকণ্ড সূত্র এবং

৫. ধর্মপদ।

তোমরা মদনমোহন তর্কালঙ্কার এর "আমার পণ" কবিতাটি শুনে থাকবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৯

চলো আজ সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করি–

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।
ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।
সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দেই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া এই বলি মনে মনে।

নিচের লিংক এবং কিউ আর কোড থেকে কবিতাটির একটি ভিডিও পেয়ে যাবে।

https://www.youtube.com/watch?v=XI8ACoXrsxk

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩০

কবিতাটি অর্থ চিন্তা করে আমাদের জীবনে কোন কোন কাজ করা উচিত আর কোন কোন কাজ করা উচিত না তার একটি তালিকা তৈরি করো।

কোন কোন কাজ করা উচিত	কোন কোন কাজ করা উচিত না

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে ঐ কাগজটি বই এর পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/ খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩১

তোমার জানা বা শুধু নাম শুনেছ, এমন কয়েকটি ধর্মীয় সুত্র বা নীতিকথার নাম লেখো।

সূত্র ও নীতিগাথা কী;

সূত্র ও নীতিগাথা হলো ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ও উপাসক-উপাসিকাদের এগুলো দেশনা করেছিলেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব রয়েছে। সূত্র ও নীতিগাথাসমূহে প্রকাশ পেয়েছে বুদ্ধের শিক্ষা বা দর্শনের মর্মবাণী। এগুলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি ইহলৌকিক মঙ্গলও সাধন করে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সূত্র ও নীতিগাথা পাঠ করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপদ, রোগ, শোক এবং অশুভ প্রভাব হতে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে সূত্র পাঠ করা হয়। যেমন, রতন সূত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হতে রক্ষা পেতে, করণীয় মৈত্রী সূত্র ভূত, যক্ষ প্রভৃতির উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে, সুপূব্বাহ্ন সূত্র অশুভ গ্রহের প্রভাব হতে রক্ষা পেতে, বোজ্ঝঙ্গ সূত্র সকল প্রকার রোগ-শোক হতে রক্ষা পেতে ও অঙ্গুলিমাল সূত্র গর্ভযন্ত্রণা হতে মুক্তি পেতে পাঠ করা হয়। ত্রিপিটকে আরও অনেক সূত্র আছে যেগুলো পাঠ করলে নানা রকম বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং বহু রকম মঙ্গল সাধিত হয়। এ অধ্যায়ে আমরা করণীয় মৈত্রী সূত্র ও নিধিকণ্ড সূত্র সম্পর্কে জানব।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি

এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন। তখন বর্ষা শুরু হবে। বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুরা পাহাড়ের গুহা বা বনের মধ্যে সুবিধামতো কোনো স্থান বসবাসের জন্য বেছে নিতেন। হিমালয়ের পাশে বনের মধ্যে একটি স্থানে পাঁচশ ভিক্ষু বর্ষাবাস শুরু করলেন। কাছাকাছি গ্রাম থেকে তাঁরা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ও ভোজন করে পরম সুখে কর্মস্থান ভাবনা করতেন। নির্মল বায়ু সেবন এবং সুখাদ্যে তাঁদের শরীর-মন বেশ ভালো হলো। কিন্তু সমস্যা হলো তাঁদের এ অবস্থানকে কেন্দ্র করে এ স্থানে বসবাসরত কিছু অমনুষ্যের উপদ্রব ও ভয় দেখানোর কারণে তাঁরা বর্ষাবাস ভেঙে শ্রাবস্তীতে ফিরে আসলেন।

বুদ্ধের সাথে ঐ ভিক্ষুদের সাক্ষাৎ হলে বুদ্ধ তাঁদের বললেন যে, বর্ষাবাসের সময় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন ভিক্ষুরা বুদ্ধের কাছে বর্ষাবাসের স্থান ছেড়ে আসার ঘটনা খুলে বললেন। সব শুনে বুদ্ধ বললেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা আবার সে-স্থানে ফিরে যাও। আমি তোমাদেরকে ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিচ্ছি"। এই বলে বুদ্ধ তাঁদের করণীয় মৈত্রী সূত্র দেশনা করলেন এবং বললেন, "এই সূত্র শিক্ষা করে বনে ফিরে যাও। প্রতিমাসের আট উপোসথ দিনে এ সূত্র উচ্চস্বরে পাঠ করবে। এ বিষয়ে ধর্মকথা বলবে, প্রশ্নোত্তর করবে, অনুমোদন করবে। সে অমনুষ্যগণ আর ভয় দেখাবে না। তোমাদের উপকারী ও হিতৈষী হবে।"

বুদ্ধের উপদেশ মতো ভিক্ষুরা সেই স্থানে গিয়ে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ ও মৈত্রী-ভাবনায় রত হলেন। করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠের প্রভাবে অমনুষ্যদের উপদ্রব বন্ধ হলো। মৈত্রী ও করুণার প্রভাবে তারা আর ভিক্ষুদের কোনো উৎপাত করলো না। অবশেষে ভিক্ষুরা সেখানে বর্ষাবাস শেষ করতে সক্ষম হন। এই সূত্রে নির্বাণ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের জন্য করণীয় মৈত্রী ভাবনার নির্দেশনা আছে, তাই সূত্রটির নাম 'করণীয় মৈত্রী সূত্র'। পালিতে এই সূত্রের নাম 'করণীয় মেত্তসুত্তং'।

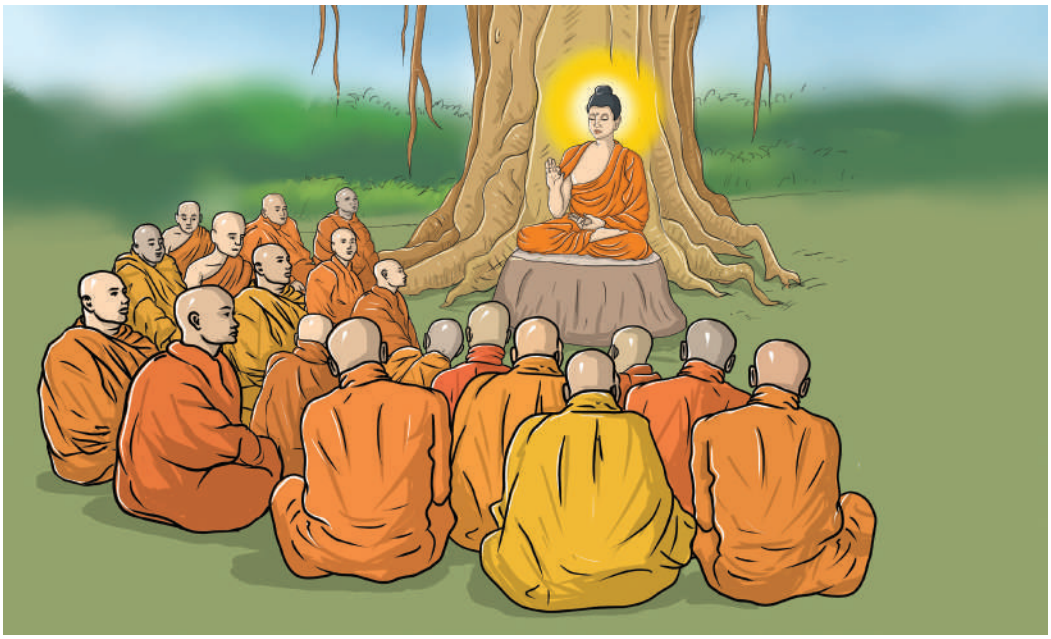

বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কাছে ধর্ম দেশনা করছেন

করণীয় মেত্তসুত্তং (পালি)

১. করণীযমত্থকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজুচ সুজুচ সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী।

২. সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

৩. ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞু পরে উপবদেয্যুং,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৪. যে কেচি পাণভূতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্ঝিমা রস্সকাণুকা থুলা।

৫. দিট্ঠা বা যেবা অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৬. ন পরো পরং নিকুব্বেথ, নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি নং কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।

৭. মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

৮. মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং, মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরং অসপত্তং।

৯. তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা সযনো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারং ইধমাহু।

১০. দিট্ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয্য গেধং ন হি জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতীতি।

করণীয় মৈত্রী সূত্র (বাংলা)

১. শান্তিময় নির্বাণলাভে ইচ্ছুক, করণীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ব্যক্তি-সক্ষম, সরল বা ঋজু, খুব সরল, সুবোধ, কোমল স্বভাব ও অভিমানহীন হবেন।

২. (তিনি সর্বদা যথালাভে) সন্তুষ্ট, সুখপোষ্য, অল্পে তুষ্ট, সংযত ইন্দ্রিয়, অভিজ্ঞ, অপ্রগল্ভ বা বিনীত এবং গৃহীদের প্রতি অনাসক্ত হবেন।

৩. তিনি এমন কোনো ক্ষুদ্র (নীচ) আচরণ করবেন না, যাতে অন্য বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারেন। সকল প্রাণী সুখী হোক, ভয়হীন বা নিরাপদ হোক, শান্তি ও সুখ উপভোগ করুক-এরকম মৈত্রীভাব পোষণ করবেন।

৪. সব প্রাণী অস্থির বা স্থির, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বা হ্রস্ব, ছোট বা স্থুল।

৫. দেখা যায় বা দেখা যায় না, দূরে বা কাছে বাস করে, জন্মেছে বা জন্ম নেবে সেই সকল প্রাণী সুখী হোক।

৬. একে অপরকে বঞ্চনা করো না, কোথাও কাউকেও অবজ্ঞা করো না। হিংসা বা ক্রোধবশত কারো দুঃখ কামনা করো না।

৭. মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

৮. সর্বলোকের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। জগতের উপরে, নীচে ও চারিদিকে যে সকল প্রাণী আছে, তারা ভেদজ্ঞান-রহিত, বৈরীহীন ও শত্রুহীন হবে।

৯. দাঁড়ানো অবস্থায়, চলমান অবস্থায়, বসা বা শোয়া অবস্থায় এবং না ঘুমানো পর্যন্ত এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে। একে ব্রহ্মবিহার বলে।

১০. শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগপূর্বক কাম ও ভোগবাসনাকে দমন করে পুনর্বার গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করেন না।

শব্দার্থ: সন্তং - শান্ত; সক্কো - সক্ষম বা সমর্থ; অভিসমোচ্চ - সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে; উজু - ঋজু বা সরল; সুজুচ - সুঋজু বা অতি সরল; সন্তস্সকো - সন্তুষ্ট ব্যক্তি; সুভরো - সুখপোষ্য বা সহজে প্রতিপালন বা সাহায্য করা যায়; অপ্পকিচ্চো - অল্পকৃত্য বা অল্প কর্তব্যযুক্ত; সল্লহকবুত্তি - যে ব্যক্তি সহজে অভাব বোধ করে না এবং অভাববোধ করলে তা সহজে পূর্ণ করে নিতে পারে, অল্পে তুষ্ট; সন্তিন্দ্রিয়ো - শান্তেন্দ্রিয়; নিপকো - প্রজ্ঞাবান; অপ্পগব্ভো - অপ্রগল্ভ, চঞ্চলতবান, বিনীত, অহংকারহীন, বিবেকবান, লজ্জাশীল, শিষ্ট; অননুগিদ্ধো - অনাসক্ত; উপবদেয্যুং - নিন্দা করা; খেমিনো - যিনি নিরাপত্তা বা শান্তি উপভোগ করেন; পাণভুতত্থি - জগতের প্রাণিকুল; থাবরা – স্থির; অনবসেসা - সম্পূর্ণরূপে; তিরিযঞ্চ - বক্রভাবে, অসলভাবে; অসম্বাধং - ভেদজ্ঞানরহিত; অবেরং - বৈরহীন; অসপত্তং - শত্রুতাহীন; তিট্ঠ - দাঁড়ানো; বিগতমিদ্ধো - না ঘুমানো পর্যন্ত; অধিট্ঠেয্য - অধিষ্ঠান; নিকুব্বেত্থ - বঞ্চনা; মানসং ভাবয়ে - মৈত্রী পোষণ করবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩২

ধর্মীয় বই, ইন্টারনেট বা অন্যন্য উৎস থেকে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দলীয়ভাবে করণীয় মৈত্রী সূত্র বিষয়ে তথ্যবৃক্ষ তৈরি করি।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব

করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো, প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারও অমঙ্গল কামনা না করা। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সব সময় সকল জীবের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করা উচিত। কারণ, মৈত্রী ভাবনা চিত্তকে সমাহিত করে। কায়-মন-বাক্য সংযত করে। বৈরিতা বা শত্রুতা দূর করে ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হতে শিক্ষা দেয়। অস্থির বা স্থির, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বা হ্রস্ব, ছোট বা স্থূল, দৃশ্য-অদৃশ্য, কাছের-দূরের, জন্মগ্রহণ করেছে বা করবে এরকম সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে এবং সর্বদা মঙ্গলকামনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। বঞ্চনা ও অবজ্ঞা করা থেকে বিরত রাখে। হিংসা পরিত্যাগ ও ক্রোধ দমন করতে সাহায্য করে। সুখে নিদ্রা যায়, সুখে ঘুম থেকে জাগে, পাপ স্বপ্ন দেখে না, মনুষ্য-অমনুষ্য সকলের প্রিয় হয়, তাঁর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। অজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করে না, মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথার্থরূপে অনুসরণে প্রেরণা যোগায়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি কায়-মন-বাক্যে কোনো পাপ করে না। ফলে তাঁদের দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সম্পাদনও সম্ভব হয় না। নিজে এবং তাঁর সঙ্গে বসবাসকারীগণ নিরুপদ্রব বা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। এভাবে মৈত্রীভাবনাকারী তৃষ্ণা নিরোধ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন এবং নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৩

করণীয় মৈত্রী সূত্রের কোন কোন বিষয় নিজ জীবনে কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি কর।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের কোন কোন বিষয় নিজ জীবনে প্রয়োগ বা চর্চা করবে	কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করবে

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে ঐ কাগজটি বই এর পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/ খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৪

করণীয় মৈত্রী সূত্রের কোন কোন বিষয় অন্যদেরও কীভাবে চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি কর।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের কোন কোন বিষয় অন্যদেরও চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে	কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

নিধিকণ্ড সূত্রের পরিচিতি

ভগবান বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে একজন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। একদিন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করছিলেন। সেই সময়ে কোশল রাজের অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি শ্রেষ্ঠীকে নেওয়ার জন্য পাঠালেন। দূত এসে রাজার আদেশ জানায়। তা শুনে শ্রেষ্ঠী দূতকে বললেন, "তুমি এখন যাও, আমি পরম নিধি (ধন) নিধান করছি।" এরপর ভগবান বুদ্ধ আহার শেষ করে দান অনুমোদন করতে গিয়ে পুণ্য সম্পদকে যথার্থ নিধি বলে 'নিধিকণ্ড সূত্র' দেশনা করেন।

নিধিকণ্ড সুত্তং

১. নিধিং নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অত্থে কিচ্ছে সমুপ্পন্নে অত্থায় মে ভবিস্সতি।

২ রাজতো বা দুরুত্তস্স চোরতো পীলিতস্স বা,
ইণস্স বা পমোক্খায় দুব্ভিক্খে আপদাসু বা;
এতদত্থায় লোকস্মিং নিধি নাম নিধিযতে।

৩. তাব-সুনিহিতো সন্তো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সব্বো সব্বদা এব তস্স তং উপকম্পতি।

৪. নিধি বা ঠানা চবতি, সঞ্ঞবাস্স বিমুযহতি,
নাগা বা অপনামেন্তি, যক্খা বা'পি হরন্তি তং।

৫. অপ্পিযা বা'পি দাযাদা উদ্ধরন্তি অপস্সতো,

যদা পুহঞ্ঞক্খযো হোতি সব্বমেতং বিনস্সতি।

৬. যস্স দানেন সীলেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইত্থিযা পুরিস্স বা।

৭. চেতিযুম্হি চ সঙ্ঘে বা পুগ্গলে অতিথিসু বা,
মাতরি পিতরি বা'পি অথো জেট্ঠম্হি ভাতরি।

৮. এসো নিধি সুনিহিতো অজেয্যো অনুগামিকো,
পহায গমনীযেসু এতং আদায গচ্ছতি।

৯. অসাধারণমঞ্ঞেসং আচোরহরণো নিধি,
কযিরাথ ধীরো পুঞ্ঞানি যো নিধি অনুগামিকো।

১০. এস দেব-মনুস্সানং সব্বকামদদো নিধি,
যং যদে বাভিপত্থেন্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

১১. সুবণ্ণতা সুস্সরতা সুসণ্ঠান সুরূপতা,
অধিপচ্চ পরিবারা সব্বমেতেন লব্ভতি।

১২. পদেসরজ্জং ইস্সরিযং চক্কবত্তি সুখং পিযং,
দেব রজ্জম্পি দিব্বেসু সব্বমেতেনে লব্ভতি।

১৩. মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিব্বান সম্পত্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৪. মিত্ত সম্পদ মাগম্ম যোনিসো বে পযুঞ্জতো,
বিজ্জা বিমুক্তি বসীভাবো সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৫. পটিসম্ভিদা বিমোক্খা চ, যা চ সাবক পারমী,
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৬. এবং মহিদ্ধিযা এসা যদিদং পুঞ্ঞসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি প-তিা কতপুঞ্ঞতন্তি।

১। অর্থ প্রয়োজন উপস্থিত হলে এটি আমার কাজে লাগবে

এই ভেবে মানুষ গভীর জলস্পর্শী গর্তে ধন প্রোথিত করে রাখে।

নিধিকণ্ড সূত্রের বাংলা অনুবাদ

১. অর্থ প্রয়োজন হলে এটি আমার কাজে লাগবে
এই ভেবে মানুষ গভীর জলস্পর্শী গর্তে ধন প্রোথিত করে রাখে।

২. রাজার দৌরাত্য, চোরের উৎপীড়ন, ঋণ, দুর্ভিক্ষ ও আপদ-বিপদ হতে
মুক্তির জন্য জগতে ধন প্রোথিত করে রাখে।

৩. গভীর উদ্দকস্পর্শী গর্তে ধন প্রোথিত হলেও তার সমুদয়
ধন সব সময় ধন-অধিকারীর উপকারে আসে না।

৪. উক্ত ধন স্থানচ্যুত হয়, তার (ধনাধিকারীর) স্মৃতি বিস্মল হতে পারে,
নাগগণ স্থানান্তরিত করতে পারে অথবা যক্ষগণ অপহরণ করতে পারে।

৫. অপ্রিয় উত্তরাধিকারীরা অজ্ঞাত সময়ে তা উদ্ধার করতে পারে অথবা যখন পুণ্য ক্ষয় হয়,
তখন এটির সমস্তই বিনষ্ট হতে পারে।

৬. স্ত্রীলোক বা পুরুষের দান, শীল, সংযম ও ধর্মগুণের দ্বারা পুণ্যরূপ
যে নিধি (ধন) সঞ্চিত (নিহিত) হয়, তা-ই প্রকৃত সুনিহিত নিধি।

৭. চৈত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে, সংঘ ক্ষেত্রে, পুদ্গল, অতিথি, মাতা-পিতা এবং ভ্রাতার সেবায়,
যে ধন নিয়োজিত হয়, এটি প্রকৃত সুনিহিত ধন।

৮. এই ধন অজেয় অর্থাৎ কেউ জয় করতে পারে না। মৃত্যুর পর এটিই অনুগামী হয়।
অন্য সব পার্থিব সম্পদ পরিত্যাগ করো এটিকে নিয়ে পরলোকে গমন করতে হয়। তাই এটিকে অজেয় অনুগামী নিধি বলা হয়।

৯. এটি অন্যের অধিকারের বাইরে, এটি চোরে চুরি করতে পারে না,
যে পুণ্যসম্পদ পরলোক পর্যন্ত যায়, পণ্ডিত ব্যক্তি সেই পুণ্য কর্মই সম্পাদন করেন।

১০. এই পুণ্যধন দেব-নরগণের সকল কামনা পূর্ণ করে,
যা যা প্রার্থনা করা হয়, এটির দ্বারা সব লাভ হয়।

১১. উত্তম দেহবর্ণ, সুমধুর কণ্ঠস্বর, অঙ্গ-সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য, আধিপত্য ও
পরিবার সম্পদ (আত্মীয়স্বজন) সকল এটির দ্বারা লাভ হয়।

১২. প্রদেশের রাজত্ব ঐশ্বর্য প্রিয় রাজচক্রবর্তী সুখ,
স্বর্গের দেবাধিপত্য (ইন্দ্রত্ব) সমস্তই এটির দ্বারা লাভ হয়।

১৩. মানবীয় সুখ-সম্পদ, দেবলোকের যে দিব্য সুখ এবং

নির্বাণের যেই অবিনশ্বর আনন্দ (সম্পদ) সমস্তই এটির দ্বারা লাভ হয়।

১৪. কল্যাণ মিত্র লাভ করে সজ্ঞানে যিনি যোগানুষ্ঠান করেন,

তাঁর বিদ্যা, বিমুক্তি, বশ্যতা (ঋদ্ধি) সমস্তই এটির দ্বারা লাভ হয়।

১৫. চার প্রতিসম্ভিদা (অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাবান), আট বিমোক্ষ (শূন্যতা, অনিমিত্ত, অপ্রনিহিত, চার অরূপ সমাধি ও সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ সমাধি) শ্রাবক-পারমী, প্রত্যেক বুদ্ধত্ব, সম্যক সম্বোধি প্রভৃতি এর দ্বারা লাভ হয়।

১৬. যেহেতু উক্ত পুণ্য সম্পদ সকল এরকম মহাঋদ্ধিসম্পন্ন,

তাই ধীর ও পন্ডিত ব্যক্তিগণ পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রশংসা করেন।

শব্দার্থ: নিধিং - নিধি বা ধন; গম্ভীরে ওদকন্তিকে - গভীর জলস্পর্শী গর্তে; রাজাতো বা দুরুত্তস্স - রাজার দৌরাত্ম্য, চোরতো পীলিতস্স বা - চোরের উৎপীড়ন; দুব্ভিক্খে - দুর্ভিক্ষে; আপদাসু - আপদকালীন; বিমুহতি - বিমূঢ় বা মতিভ্রম; অপনামেন্তি - অপসারণ; নাগা - নাগ; যক্খা - যক্ষ; সংযমেন - সংযম; ইত্থিয়া - স্ত্রীলোক; পুরিসস্স - পুরুষ; চেতিযম্হি - চৈত্য; অতিথীসু - অতিথি; ভাতরি - ভাই; অজেয্যো - অজেয়; অনুগামিকো - অনুগমণকারী; অসাধারনমঞ্ঞেঞ্ঞসং - অসাধারণ; আধিপচ্চপরিবারো - আধিপত্য পরিবার; পটিসম্ভিদা - প্রতিসম্ভিদা; বিমোক্খা - বিমোক্ষ; পসংসন্তি - প্রশংসা করে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৫

ধর্মীয় বই, ইন্টারনেট বা অনান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দলীয়ভাবে নিধিকণ্ড সূত্র বিষয়ে তথ্যবৃক্ষ তৈরি করি।

নিধিকণ্ড সূত্রের গুরুত্ব

অর্থ বা সম্পদ ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগবে এ চিন্তা করে অতীতকালে মানুষেরা গভীর গর্তে ধন বা নিধি পুঁতে রাখতেন। উত্তমরূপে পুঁতে রাখা ধন বা নিধি রাজার দৌরাত্ম্য, চোরের উৎপীড়ন, ঋণ ও দুর্ভিক্ষের কারণে নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় ধন স্থানচ্যুত হতে পারে। নাগ ও যক্ষ এবং অপ্রিয় উত্তরাধিকারীরা এই নিধি অপহরণ করতে পারে। পুণ্যক্ষয় হলে এমনিতেই এ সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ হলো এ জাগতিক অর্থ বা ধন প্রকৃত সুনিহিত নিধি বা ধন নয়। দান শীল, সংযম, দম, চৈত্য, প্রতিষ্ঠা, সংঘ, মাতা-পিতা, অতিথি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগ্নির সেবায় যে ধন বা পুণ্যনিধি নিয়োজিত হয় সে ধনই প্রকৃত সুনিহিত নিধি বলা যায়। কারণ এটি অজেয় ও অনুগামী নিধি। অন্যান্য ধন পরলোকে গমন করবার সময় নিয়ে যেতে পারে না কিন্তু এ পুণ্য সম্পদ ইহকালেও ভোগ করে পরকালেও অনুগমন করে। পূণ্য সম্পদ কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আবার এটি যেহেতু মৃত্যুর সাথে সাথে অনুগমন করে পরবর্তীতে তিনি এ পুণ্যসম্পদের কারণে তার প্রার্থীত যাবতীয় মনস্কামনা পূর্ণতা সাধন করতে পারে। তাই বর্তমান যুগেও শুধুমাত্র টাকা-পয়সা বা বিশাল সম্পদের পিছনে জীবনের অধিকাংশ সময় নষ্ট না করে দান, শীল, ভাবনা, পরোপকারিতা, মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার শিক্ষা নিধিকণ্ড সূত্র থেকে আমরা লাভ করতে পারি।

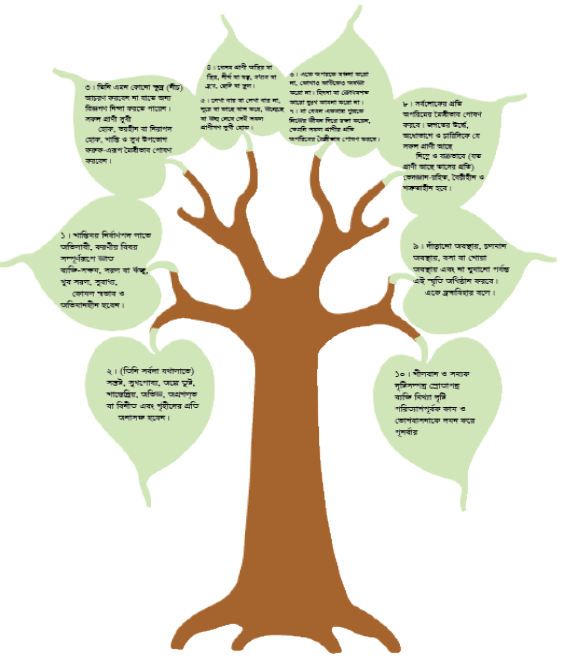

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৬

নিধিকণ্ড সূত্রের কোন কোন বিষয় নিজ জীবনে কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করো।

নিধিকণ্ড সূত্রের কোন কোন বিষয় নিজ জীবনে প্রয়োগ বা চর্চা করবে	কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করবে

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৭

নিধিকণ্ড সূত্রের কোন কোন বিষয় অন্যদেরও কীভাবে চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি কর।

নিধিকণ্ড সূত্রের কোন কোন বিষয় অন্যদেরও চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে	কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ধর্মপদ গ্রন্থের পরিচয়

ধর্মপদ সূত্র পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এটি একটি কাব্যগ্রন্থ। ধর্ম পদে ৪২৩টি গাথা এবং ২৬টি বর্গ রয়েছে। এর গাথাগুলির বেশির ভাগ ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গাথা স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব রীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীবৃন্দ ধর্মপদের গাথাসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গ্রন্থটি আজও বিশ্বমানবের চিত্তকে গভীর ও নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে। অতীতে এ গ্রন্থ সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত এ তিনটি ভারতীয় ভাষাতেই প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয়েছে।

'ধর্মপদ'-এর 'ধর্ম' ও 'পদ' শব্দ দুটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ধর্মপদের 'ধর্ম' শব্দের অর্থ 'নীতি', 'মূলনীতি', 'বিষয়', 'পুণ্য' এবং 'পদ' শব্দের অর্থ 'কারণ', 'পদক্ষেপ', 'পথ', 'গুচ্ছ', 'শ্লোক' প্রভৃতি। ধর্মপদ গ্রন্থের নাম নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়। যেমন : 'পুণ্যের পথ', 'ধর্মের পথ', 'সত্যের পথ' প্রভৃতি।

ধর্মপদের উপদেশ সর্বকালীন এবং বিশ্বজনীন। গ্রন্থটি জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে সমাদৃত হয়েছে। ধর্মপদের অমৃতবাণী মানব কল্যাণ আর বিশ্বমৈত্রীর মূর্ত প্রতীক। বাণীগুলো মানব জীবনকে ক্ষুদ্র সত্তা থেকে মুক্ত করে অসীমের সন্ধানে মহত্ত্বের দিকে নিয়ে যায়। জীবনকে সম্যক উপলব্ধির জন্য নীতিবাক্যসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মপদের আবেদন অনেক প্রাণস্পর্শী। ধর্মপদ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ, এটি ভারত উপমহাদেশকে পৃথিবীতে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ধর্মপদ গ্রন্থের নৈতিক গুরুত্ব

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তনের যুগে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি ও ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধর্মপদ সংকলিত হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে দান, শীল, ভাবনায় অনুপ্রাণিত করা; ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন, ইন্দ্রিয় সংযমের উপকারিতা, চিত্ত শাসনের সুফল ইত্যাদি বিষয় অতি সহজ, সরল ভাষায়

ধর্মপদে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে যুক্তির মাধ্যমে প্রকৃত মানবের স্বরূপ, বৌদ্ধ ভিক্ষুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পাপ-পুণ্যের কার্যকারিতা, মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা এবং বৈরিতার পরিণাম সম্পর্কে মানব সমাজকে সর্তক করে দেওয়া হয়েছে। মূলত ধর্মপদ নামের মধ্যেই রয়েছে গ্রন্থের মূল বক্তব্য। বৌদ্ধ ধর্মের নির্ধারিত পথ অনুসরণ করার জন্যে ধর্মপদ পাঠের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এ গ্রন্থের নিবেদন হলো ধর্মের মাধ্যমে জনগণের নৈতিক জীবন গঠন করা। মানব মনের সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ এবং উন্নত মননশীলতার আদর্শ প্রচার করা।

ধর্মপদে বৌদ্ধ দর্শনের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত হয়েছে। এতে যে কয়টি শ্রেষ্ঠ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে: চার আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ক্ষান্তি, বিরাগ, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা ও নির্বাণ। চতুরার্য সত্য হলো - দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায়। এখানে প্রথম আর্যসত্য দুঃখ বলতে বোঝায় জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক-বিলাপ, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ এবং আশার অতৃপ্তিজনিত দুঃখ। বলতে গেলে পঞ্চস্কন্ধরূপ মানব দেহ ধারণই দুঃখ। ধর্মপদের একাদশ অধ্যায়ে দেহকে বলা হয়েছে- কতগুলো পচনশীল উপাদানের সমষ্টি, ব্যাধি ও অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণার আগার; রোগ-শোক ও জরা তার নিত্য সঙ্গী। আর তার থেকেই দুঃখের ক্রমাগত সৃষ্টি।

সকল দুঃখের কারণ হলো তৃষ্ণা। বেদনা বা অনুভূতি থেকে তৃষ্ণার উৎপত্তি। তৃষ্ণা মানুষকে জন্ম, মৃত্যুরূপে দুঃখ চক্রে আবর্তিত করে, বন্ধনের ভার বৃদ্ধি করে। কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা এবং বিভব তৃষ্ণার মতো, তৃষ্ণাজাল থেকে অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে। তৃষ্ণাজয়ের মধ্যেই পঞ্চস্কন্ধ জয়ের চাবিকাঠি। কিভাবে তৃষ্ণাকে জয় করে জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু শোক প্রভৃতির উপশম করা যায় তার ইঙ্গিত এ গ্রন্থে আছে।

দুঃখের নিরোধ হলো নির্বাণ। একমাত্র নির্বাণে দুঃখের অস্তিত্ব বিলোপ হয়। নির্বাণ পরম সুখ। এটি উপলব্ধির বিষয় এবং অনির্বচনীয়। ধর্মপদে নির্বাণকে বলা হয়েছে - যোগক্ষেম, অব্যাখ্যাত, জাতিক্ষয়, অমৃতপদ এবং সংস্কার উপশমকারী। দুঃখ নিরোধের উপায় হলো– নির্বাণ লাভ করা। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার পূর্ণতা বিধান ছাড়া নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়। শীল পালনের দ্বারা কায়-বাক্য-মনের পবিত্রতা সাধন এবং পবিত্র মনে স্মৃতি সাধনায় বিরত থাকলে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞা ভাবনার মাধ্যমে তৃষ্ণাক্ষয়ে সকল দুঃখের অন্ত নির্বাণ উপলব্ধি হয়। তাই ধর্মপদের নৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীদের আলোচনা।

ধর্মপদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গাথা এবং বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো:

১. ‘অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে’
যে চ তং উপনযহন্তি বেরং বেরং তেসুপসম্মতি।

বাংলা- আমাকে আক্রোশ করল, আমাকে প্রহার করল, আমাকে পরাজয় করল কিংবা আমার (সম্পত্তি) হরণ করল,যারা এমন চিন্তা পোষণ করে না, তাদের শত্রুতার উপশম হয়।

২. নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী’ধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।

বাংলা- জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার উপশম হয় না,
মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়; এটাই চিরন্তন ধর্ম।

৩. সারঞ্চ সারতো ঞত্বা, অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি, সম্মাসংকপ্পগোচরা।

বাংলা- যারা সার বস্তুকে সার এবং অসারবস্তুকে অসাররূপে জানেন,
সেই সম্যক সংকল্পপরায়ন ব্যক্তিরা প্রকৃত সারবস্তু লাভ করতে সমর্থ হন।

৪. অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথামাতা।

বাংলা- অপ্রমাদ অমৃত লাভের উপায়, প্রমাদ মৃত্যুর পথ,
অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা অমর আর যারা প্রমত্ত তারা মৃতস্বরূপ।

৫. ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,
অত্তনো’ব অবেক্খেয্য কতানি অকাতানি চ।

বাংলা- পরের বিচ্যুতির প্রতি কিংবা পরের কৃত ও অকৃত কার্যের প্রতি লক্ষ্য করবে না,
নিজের কৃত ও অকৃত কার্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

৬. মধু’ব মঞ্ঞতি বালো যাব পাপং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ বালো দুক্খং নিগচ্ছতি।

বাংলা- যতদিন পাপ পরিণতি লাভ না করে ততদিন মূর্খ সেটিকে মধুময় মনে করে,
কিন্তু পাপ যখন পরিণত হয় তখন মূর্খকে দুঃখ ভোগ করতে হয়।

৭. ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে,
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে।

বাংলা- পাপী মিত্রের সংসর্গ করবে না, নরাধম ব্যক্তির সংসর্গ করবে না;
কল্যাণমিত্রদের ও পুরুষোত্তমদের সংসর্গ করবে।

৮. যো সহস্সং সহস্সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে,

একঞ্চ জেয়্যমত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো।

বাংলা- যে ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র সহস্র মানুষকে জয় করে তার তুলনায়
যিনি কেবল নিজেকে জয় করেন, তিনিই সর্বোত্তম সংগ্রামজয়ী।

৯. যো চ বস্সসতং জীবে দুস্সীলো অসমাহিতো,
একাহং জীবিতং সেয়্যো সীলবন্তস্স ঝাযিনো।

বাংলা- যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র ও অসমাহিত হয়ে শতবর্ষ জীবিত থাকে,
তার জীবন অপেক্ষা সচ্চরিত্র ধ্যানী ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেয়।

১০. যো চ বস্সসতং জীবে কুসীতো হীনবীরিযো,
একাহং জীবিতং সেয়্যো বিরিয়মারভাতো দল্হং।

বাংলা- যে ব্যক্তি অলস ও হীনবীর্য হইয়া শতবর্ষ বেঁচে থাকে,
তার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়পরাক্রম ও বীর্যপরায়ণ পুরুষের একটি দিনের জীবনও শ্রেয়।

১১. ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজ্ঝে
ন পববতানং বিবরং পবিস্স,
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো
যত্থট্ঠিতো মুঞ্চেয়্য পাপকম্মা।

বাংলা- অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে কিংবা পর্বত গুহা যেখানেই প্রবেশ করো না কেন,
জগতে এমন স্থান নেই যেখান থেকে পাপকর্ম (ফলভোগ) হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

১২. সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো,
অত্তানং উপমং কত্বা না হনেয়্য না ঘাতয়ে।

বাংলা- সবাই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত,
নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে আঘাত কিংবা হত্যা করবে না।

১৩. অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিয়া?
অত্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।

বাংলা- নিজেই নিজের নাথ (ত্রাণকর্তা); এছাড়া অপর কে কার নাথ?
সুদান্ত ব্যক্তি আপনার মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করেন।

১৪. উত্তিট্ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মাচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।

বাংলা- উদ্যম করো, প্রমত্ত হয়ো না। উত্তমরূপে ধর্ম আচরণ করো।
ধর্মাচারী ইহলোক ও পরলোকে সুখে অবস্থান করে।

১৫. সব্বাপাপস্স অকরণং কুসলসস উপসম্পদা,
সচিত্তপরিযোদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং।

বাংলা- সমস্ত পাপ থেকে বিরতি (শীল), কুশল কর্মের পরিপূর্ণতা (প্রজ্ঞা) ও স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন (সমাধি)–এটিই বুদ্ধের অনুশাসন।

১৬. আরোগ্য পরমা লাভা সন্তুষ্ঠি পরমং ধনং,
বিস্সাসপরমা ঞাতী নিব্বানং পরমং সুখং।

বাংলা- আরোগ্য পরম লাভ; সন্তোষ পরম ধন; বিশ্বস্ত লোকই পরমাত্মীয় এবং নির্বাণই পরম সুখ।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৮

ধর্মীয় বই, ইন্টারনেট বা অন্যান্য উৎস থেকে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দলীয়ভাবে ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথা বিষয়ে তথ্যবৃক্ষ তৈরি করি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৯

ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথার কোন কোন বিষয় নিজ জীবনে কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি কর।

ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথার কোন কোন বিষয় নিজ জীবনে প্রয়োগ বা চর্চা করবে?	কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করবে

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪০

ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথার কোন কোন বিষয় কীভাবে অন্যদেরও চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করো।

ধর্মপদের কয়েকটি নীতিগাথার কোন কোন বিষয় অন্যদেরও চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে	কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪১

পরিকল্পনা তৈরির অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?

কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতা সমূহ)?

সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

জাতক, চরিতমালা ও উপাখ্যান

এ অধ্যায় পাঠ করে আমরা জানতে পারব–

১. জাতক;

২. জাতকের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব;

৩. শীলমীমাংসা জাতক এবং জনসন্ধ জাতক;

৪. আনন্দ থের এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমীর জীবন ও কর্ম;

৫. মহা উপাসিকা বিশাখার জীবন ও কর্ম।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪২

তোমাদের আশেপাশে অনেক মানুষ বসবাস করেন। কেউ পরিচিত কেউবা অপরিচিত। এ যাবৎকালে তোমার দেখা সবচেয়ে ভালো/আদর্শ মানুষ সম্পর্কে লেখো।

নাম-

পরিচয়-

বক্তব্য:

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

জাতক

জাতক শব্দটি 'জাত' শব্দ থেকে এসেছে। জাত শব্দের অর্থ হলো জন্ম, উৎপন্ন, উদ্ভূত ইত্যাদি। যিনি জাত বা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাকে বলা হয় 'জাতক'। বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবন কাহিনিগুলো 'জাতক' নামে পরিচিত। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় ঘটনা প্রসঙ্গে উপদেশ দিতে গিয়ে তাঁর অতীত জন্মের কাহিনি বর্ণনা করতেন। গৌতম বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করার জন্য ৫৫০ বার বিভিন্ন প্রাণী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এসব জন্মে তিনি কখনো মানুষ, কখনো পশুপাখি, কখনো দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের এ অবস্থাকে বলা হয় বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বগণ সাধারণত বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করে থাকেন। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, ভাবনা, অধিষ্ঠান ও উপেক্ষা – এই দশ প্রকার পারমিতা চর্চা করে চরিত্রের চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। এর ফলে শেষ জন্মে পূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং সম্যক সম্বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। জাতক কাহিনিগুলোতে বোধিসত্ত্ব কোনোটিতে প্রধান চরিত্রে, কোনোটিতে পার্শ্বচরিত্রে কোনোটিতে গৌণ চরিত্রে আবার কোনোটিতে তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। তবে অধিকাংশ জাতকে তাঁকে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যায়।

জাতকের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

জাতক কাহিনিগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, গল্প বলার মাধ্যমে শ্রোতাদের সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করা। গল্পের মাধ্যমে নৈতিক ও মানসিক গুণাবলির বিকাশ সাধন জাতক কাহিনিগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে। গল্পের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয় মানুষের অন্তরের গভীরে রেখাপাত করে। বুদ্ধ ধর্মদেশনার সময় প্রসঙ্গক্রমে তাঁর অতীত জীবনের গল্পগুলোর মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা ও মানবিক গুণাবলি প্রকাশ করতেন। এর প্রভাবে তাঁর শিষ্যরা আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হতেন। উল্লেখ্য, জাতক কাহিনিগুলোতে অতিপ্রাকৃতের কিছুটা ছাপ থাকলেও জাতকের ঘটনাগুলো একান্তভাবে জীবনসম্পৃক্ত। জাতকের কোনো চরিত্রে বোধিসত্ত্বকে মানবিক চরিত্রের পূর্ণপ্রতীক রূপে প্রতীয়মান হয়। তিনি কোথাও অতি মানবরূপে চিত্রায়িত হননি। জাতকে কোথাও অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি।

জাতকের গল্পগুলোর একটি বিশেষ গঠন আছে। প্রতিটি জাতকের গল্পে তিনটি অংশ থাকে। প্রথম অংশে বুদ্ধ যে ঘটনা বা প্রসঙ্গে জাতকটি বলেছেন, তার পরিচয় দেওয়া হয় - এটিকে বলা হয় প্রত্যুৎপন্ন বস্তু। দ্বিতীয় অংশে থাকে মূল গল্প বা জাতকের কাহিনি, যাকে বলা হয় অতীতবস্তু। তৃতীয় অংশে দেওয়া হয় ঘটনায় অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব পরিচয়, যার নাম সমবধান। এভাবে বুদ্ধের মুখ থেকে তাঁর শিষ্য বা সমসাময়িক ব্যক্তিদের অতীত জন্মের কাহিনিও জানা যায়।

জাতকের গুরুত্ব বিভিন্নমুখী। জাতক সাহিত্য পাঠে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা, প্রাচীন প্রসিদ্ধ জনপদ ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায়। বিশ্বসাহিত্য ভান্ডারে গল্প, উপন্যাস, নাটক, উপাখ্যান, ছোটগল্প প্রভৃতি রচনার উৎস হিসেবেও জাতকের ভূমিকা আছে বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। এজন্য জাতককে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জাতক প্রাচীন ইতিহাসের এক মূল্যবান ভান্ডার। বুদ্ধযুগের সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, ধর্মদর্শন জানার জন্য জাতক গুরুত্বপূর্ণ।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৩

জাতকের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

শীলমীমাংসা জাতক

প্রত্যুৎপন্নবস্তু

কোশলরাজের অন্নে প্রতিপালিত শীলমীমাংসক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ত্রিশরণাগত ছিলেন, সব সময় পঞ্চশীল পালন করতেন। তিনি বেদসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন। কোশলরাজ তাঁকে শীলবান হিসেবে যথেষ্ট সম্মান করতেন। একদিন শীলমীমাংসক ভাবলেন, 'রাজা কী কারণে আমাকে সম্মান করেন, আমার বংশ গৌরবের জন্য নাকি আমার চরিত্রগুণের জন্য, তা জানা দরকার।' এরকম চিন্তা করে একদিন তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় রাজার ধনরক্ষকের ধনভান্ডার থেকে এক কার্ষাপণ (টাকা) নিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় দিন দুই কার্ষাপণ নিয়ে গেলেন। ধনরক্ষক এটি দেখেও কিছু বললেন না। পরদিন এক মুষ্টি কার্ষাপণ নিয়ে যাবার সময় ধনরক্ষক বললেন, 'আর্য, আপনি পরপর তিন দিন রাজার ধন চুরি করেছেন।'এরকম বলে তিনি চিৎকার করে বললেন, রাজার ধন হরণকারীকে ধরেছি।' তা শুনে অনেক লোক একত্র হয়ে ব্রাহ্মণকে উত্তমমধ্যম দিয়ে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি এমন দুঃশীল কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছ কেন?' এরপর রাজকর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন, তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করার জন্য। তখন ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহারাজ, আমি চোর নই। আপনি আমাকে খুবই সম্মান করেন। ভাবলাম, কেন আমাকে সবাই সম্মান করেন— এটি কি আমার বংশ, গোত্র কিংবা চারিত্রিক বিশুদ্ধতার কারণে, তা পরীক্ষা করার জন্য আপনার ধনভান্ডার থেকে অর্থ হরণ করেছিলাম। এখন বুঝতে পেরেছি যে, চারিত্রিক বিশুদ্ধতার জন্যই আমি সবখানে সম্মানিত হচ্ছি, বংশ গোত্রের জন্য নয়। কিন্তু গৃহে অবস্থান করে ভোগসম্পত্তিতে লিপ্ত থেকে জীবনে কখনো চরিত্রবান হতে পারব না। অতএব, আজই জেতবনে বুদ্ধের কাছে গিয়ে আমি প্রব্রজিত হব।'তারপর রাজার অনুমতি নিয়ে ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে গিয়ে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করলেন। তিনি অচিরে অর্হত্ত্ব মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

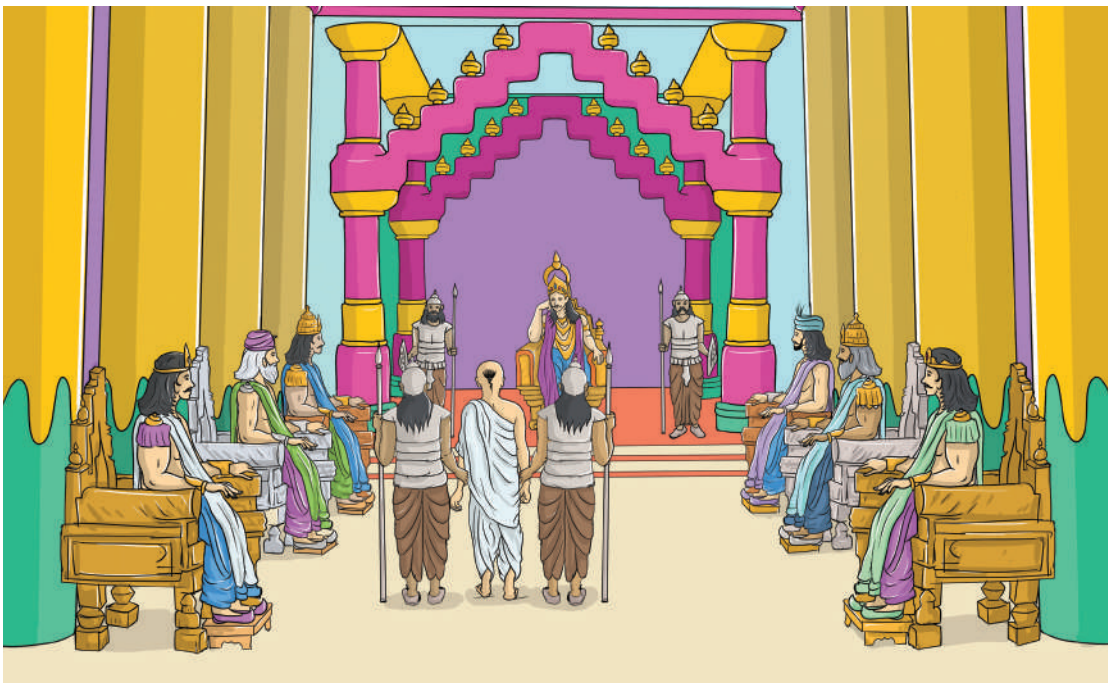

শীলমীমাংসা জাতকের ছবি

ব্রাহ্মণের অর্হত্বলাভের কথা সঙ্ঘমধ্যে প্রচার হলো। তখন ভিক্ষুসঙ্ঘ ধর্মসভায় সমবেত হয়ে আলোচনা করতে লাগলেন, 'দেখ শীলমীমাংসক ব্রাহ্মণ রাজার উপস্থাপক ছিলেন। তিনি নিজের চরিত্রবল পরীক্ষা করতে গিয়ে শেষে রাজসভা ও সংসার ত্যাগ করে অর্হত্বে উপনীত হয়েছে।' এভাবে ব্রাহ্মণের গুণকীর্তন করার সময় ভগবান বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কথোপকথন শুনতে পেয়ে বললেন, 'কেবল এই ব্রাহ্মণই যে নিজের চরিত্রবল পরীক্ষাপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে মুক্তি লাভ করেছেন তা নয়, পণ্ডিতেরাও অতীতকালে এভাবে করেছিলেন।' এরপর তিনি সেই অতীত কথা বলতে লাগলেন:

অতীত বস্তু

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁর পুরোহিত ছিলেন। রাজা অন্যসব ব্রাহ্মণের চেয়ে তাঁকে বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। এই রাজপুরোহিতও শীলমীমাংসক ব্রাহ্মণের মতো রাজ ধন হরণ করায় তাঁকে বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন, পথে একস্থানে সাপুড়েরা সাপ নিয়ে খেলা করছে। তারা সাপ নিয়ে নিজেদের গলায় জড়াচ্ছে। তা দেখে ব্রাহ্মণ বললেন, 'ওহে, তোমরা সাপটাকে এমন করে ধরবে না, নিজেদের গলায়ও জড়াবে না; তোমাদের দংশন করতে পারে।' সাপুড়েরা বললেন, 'ঠাকুর, আমাদের সাপ শীলবান ও আচার সম্পন্ন, তোমার মতো দুঃশীল নয়। তুমি দুঃশীল, তাই রাজার ধন চুরি করেছ এবং সেজন্য রাজকর্মচারীরা তোমাকে বেঁধে রাজদরবারে নিয়ে যাচ্ছে।'

এ কথা শুনে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'যদি সাপ দংশন বা আঘাত না করে, তাহলেও লোকে তাকে শীলবান বলে, মানুষের তো কথাই নেই। ইহলোকে শীলই শ্রেষ্ঠ। তার চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে না।'

বোধিসত্ত্বকে রাজার কাছে নেওয়া হলে রাজা সব বিষয় জেনে তাঁকে শাস্তিদানের নির্দেশ দিলেন। বোধিসত্ত্ব আগের মতো বললেন, 'মহারাজ, আমি চোর নই। চারিত্রিক গুণ পরীক্ষা করার জন্য আমি এই অর্থ চুরি করেছি।

আমি বুঝতে পেরেছি যে, শীলই সর্বোৎকৃষ্ট, শীলের মতো আর কিছু নেই। কায়বাক্য মনে শীল পালন করলে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।' এভাবে বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে সব বিষয় বাসনা ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে ধ্যানসাধনা বলে পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করেন। মৃত্যুর পরে তিনি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন।

সমবধান: তখন রাজপুরোহিত ছিলেন বোধিসত্ত্ব এবং রাজপুরুষরা ছিলেন তাঁর শিষ্য।

উপদেশ: শীলগুনের সমান আর কিছু নেই।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৪

শীলমীমাংসা জাতকে যে যে উপদেশের/মানবীয় গুণের উল্লেখ রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করো

শীলমীমাংসা জাতক

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৫

তুমি শীল মীমাংসা জাতকের যে যে উপদেশের/মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করেছ তার মধ্যে কোন গুণগুলো তুমি পালন করতে চাও এবং কীভাবে পালন করবে তা লেখো।

যে গুণগুলো পালন/চর্চা করতে চাই	কীভাবে পালন/চর্চা করব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৬

তুমি শীলমীমাংসা জাতকের যে যে উপদেশের/মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করেছ, তার মধ্যে কোন গুণগুলো তুমি তোমার পরিবারে সদস্য/সহপাঠীদের পালন বা চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে তা লেখো।

যে গুণগুলো পালন/চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে চাই	কীভাবে পালন/চর্চায় উদ্বুদ্ধ করব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

জনসন্ধ জাতক

প্রত্যুৎপন্ন বস্তু: বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করার সময় কোশলরাজকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এ কাহিনি বলেছিলেন। কোশলরাজ একসময় ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে রাজকাজে উদাসীন হয়ে পড়েন। ধর্মাচার এবং বিচারকাজ করতেন না, এমনকি বুদ্ধের উপাসনার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন বুদ্ধের কথা মনে পড়লে তিনি বুদ্ধকে প্রণাম করতে আসেন। রাজা বুদ্ধকে বন্দনা করে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেন তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করলে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ রাজাকে বলেন, রাজকাজে অবহেলা করা উচিত নয়। রাজাদের প্রজাবৎসল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া, রাজা ধার্মিক হলে রাজপুরুষেরাও ধার্মিক হন। রাজ্যে নিরন্তর শান্তি বজায় থাকে। অতীত কালের কোনো কোনো রাজা দশধর্ম পালনসহ রাজ্য শাসন করে মৃত্যুর পর স্বর্গবাসী হয়েছিলেন। কোশলরাজ সে রাজার কথা শোনার জন্য প্রার্থনা করলে বুদ্ধ কাহিনিটি বর্ণনা করলেন।

অতীতবস্তু: অনেক দিন আগে বারানসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত রাজার পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামকরণ করা হয় জনসন্ধ। বিদ্যাশিক্ষার বয়স হলে তাঁকে তক্ষশীলায় পাঠানো হয়। সব শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে তিনি বারাণসীতে ফিরে আসেন। পুত্রের সাফল্যে আনন্দিত হয়ে রাজা সকল বন্দিকে মুক্তি দেন। এরপর রাজকুমার জনসন্ধকে অভিষিক্ত করেন উপরাজপদে। তাঁর শাসনে রাজ্যের প্রজাবৃন্দ সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে থাকেন।

বোধিসত্ত্ব জনসন্ধের অভিষেকের কয়েক বছর পর রাজার মৃত্যু হয়। প্রজারা বোধিসত্ত্বকে রাজা নির্বাচন করেন। রাজা নগরের চার দ্বারে, মধ্যখানে ও রাজপ্রসাদের কাছে ছয়টি দানশালা নির্মাণ করে প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন। রাজার এরকম মহাদান দেখে জম্বুদ্বীপবাসী বিস্মিত হন এবং রাজ্যের প্রজারা খুব সন্তুষ্ট হন। চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কোথাও কোনো অপরাধ সংঘটিত হতো না। কারাগার শূন্য হয়ে গেল।

বোধিসত্ত্ব পঞ্চশীল পালন করতেন। অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা-তিথিতে উপোসথশীল পালন করতেন। যথানিয়মে রাজ্য শাসন করতেন। রাজা প্রজাসাধারণকে সৎকার্য করায় ও সৎভাবে জীবনযাপনে উপদেশ দিতেন।

একদিন রাজা জনসন্ধ ভাবলেন, প্রজারা যাতে সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারেন, তাদের মঙ্গল সাধিত হয় এবং তারা যাতে অপ্রমত্তভাবে জীবন যাপন করেন, তাদের সে রকম কিছু উপদেশ দেব। তিনি ভেরি বাজিয়ে সমগ্র রাজ্যবাসীকে এক জায়গায় সমবেত করলেন। রাজা রাজ্যবাসীকে উদ্দেশ করে বললেন, প্রিয় রাজ্যবাসী! মনোযোগ দিয়ে আমার উপদেশ শোনো এবং সুষ্ঠুরূপে সেসব প্রতিপালন করবে।

১. বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করবে।

২. যৌবনকালে ধনসম্পদ উপার্জন করবে।

৩. কূটকর্ম ও কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করো।

৪. নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ হবে না।

৫. মাতা-পিতা ও গুরুজনের সেবা করবে।

৬. গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

৭. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও সাধুব্যক্তিকে সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করবে।

৮. প্রাণিহত্যা ও হিংসা থেকে বিরত থাকবে।

৯. অকৃপণভাবে খাদ্যভোজ্য ও পানীয় সামগ্রী দান করবে।

১০. পরপুরুষ বা পরনারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরদ্বার লঙ্ঘন করবে না। অপ্রমত্তভাবে দশধর্ম পালন করবে।

উপরের দশটি উপদেশকে ‘দশ রাজধর্ম’ বা ‘দশবিধ কর্তব্য’ বলা হয়। রাজা উক্ত দশ রকম উপদেশ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেও সৎভাবে জীবন যাপন করতেন এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাজকাজ পরিচালনা করতেন।

সমবধান: আমি ছিলাম সে প্রাচীন রাজা জনসন্ধ এবং আমার শিষ্য প্রশিষ্য ছিল পারিষদবর্গ।

উপদেশ: রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৭

জনসন্ধ জাতকে যে যে উপদেশের/মানবীয় গুণের উল্লেখ রয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

জনসন্ধ জাতক

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৮

তুমি জনসন্ধ জাতকের যে যে উপদেশের/মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করেছ তার মধ্যে কোন গুণগুলো তুমি পালন করতে চাও এবং কীভাবে পালন করবে তা লেখো।

যে গুণগুলো পালন/চর্চা করতে চাই	কীভাবে পালন/চর্চা করব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৯

তুমি জনসন্ধ জাতকের যে যে উপদেশের/মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করেছ, তার মধ্যে কোন গুণগুলো তুমি তোমার পরিবারে সদস্য/সহপাঠীদের পালন বা চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে তা লেখো।

যে গুণগুলো পালন/চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে চাই	কীভাবে পালন/চর্চায় উদ্বুদ্ধ করব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

জনসন্ধ জাতকের আলোকে একজন শাসক কীভাবে রাজ্যশাসন করবেন–লেখো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ: ৫০

একজন শাসকের কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন–উল্লেখ করো।

চরিতমালা

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে কয়েকজন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং মহান ব্যক্তির অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ ধর্মের বিকাশে, কেউ বুদ্ধের জীবনে ও সংঘের সেবায় অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। সেসব শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং মহান ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কাজের বর্ণনাকে চরিতমালা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ চরিতমালা সম্পর্কে জানা প্রত্যেক বৌদ্ধের একান্ত প্রয়োজন।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে থের-থেরীদের অবদান অনেক। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীব্রত নিয়ে যাঁরা দশ বছর অতিক্রম করেন তাঁদের থের বা থেরী বলা হয়। থের শব্দের অর্থ স্থবির, প্রবীণ, জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রৌঢ়, বয়োবৃদ্ধ, বয়োজ্যেষ্ঠ ইত্যাদি। থের-থেরী প্রবীণ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর উপাধিবিশেষ। মহৎ কর্মগুণে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করে আছেন। সুত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ে 'থেরগাথা' ও 'থেরীগাথা' নামে দুটি গ্রন্থ আছে, সেখানে থের ও থেরীদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাসমূহ গাথা ছন্দে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের এসব অভিজ্ঞতা পাঠকের চিত্তকে বিস্মিত ও অভিভূত করে তোলে। থের-থেরীদের জীবন ও গাথাগুলো আমাদের নৈতিক জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। বৌদ্ধধর্মের বিকাশে তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়। জীবনকে ধর্মীয় ভাবধারায় গড়ে তোলার জন্য থের-থেরী ও বরেণ্য মনীষীদের জীবনচরিত পাঠ করা উচিত। এ পর্যায়ে আমরা আনন্দ থের ও মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানব।

আনন্দ থের

আনন্দ ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতৃতুল্য অমিতোদন শাক্যের পুত্র। সিদ্ধার্থ ও আনন্দ একইদিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মে পরিবারে খুব আনন্দ হয়েছিল বলে তাঁর এই নাম রাখা হয়। আনন্দ অনুরুদ্ধ, ভদ্রীয়, কিম্বিল, দেবদত্ত এবং ক্ষৌরকার পুত্র উপালি একইদিনে বুদ্ধের কাছে ভিক্ষু সঙ্ঘে দীক্ষিত হন।

উপসম্পদা গ্রহণের পর তিনি পুন্ন মন্তানি পুত্রের কাছে ধর্মকথা শুনে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন।

বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য, স্মৃতিধর এবং সুদেশক হিসেবে আনন্দের সুখ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর শান্ত স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সব ভিক্ষুর কাছে তিনি খুবই প্রিয় ছিলেন; সাধারণ উপাসক-উপাসিকার কাছেও ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁকে সবাই সমানভাবে বিশ্বাস করতেন।

বুদ্ধত্ব লাভের পর বহু বছর ধরে বুদ্ধের কোনো স্থায়ী সেবক ছিলেন না। নাগসামাল, নাগিত, উপবান, সুনক্ষত্র, চুন্দ, সাগত প্রমুখ ভিক্ষুরা অস্থায়ীভাবে তাঁর সেবা করছিলেন। বুদ্ধের বয়স যখন ৫৫ বছর, তখন একবার ধর্মসভায় বুদ্ধের স্থায়ী সেবক নিযুক্ত করার প্রশ্ন ওঠে। তখন সারিপুত্র-মৌদ্গাল্যায়ন প্রমুখ খ্যাতনামা ভিক্ষু এ পদের প্রার্থী হন। কিন্তু বুদ্ধ কারো প্রার্থনা অনুমোদন করেননি । তখন সেবক পদের জন্য আনন্দ স্থবিরের নাম প্রস্তাবিত হলে আনন্দ নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সেবক পদ গ্রহণে সম্মত হন। শর্তগুলো যথাক্রমে–

১. বুদ্ধের প্রাপ্ত চীবর আনন্দকে প্রদান করবেন না।
২. বুদ্ধের প্রাপ্ত পিণ্ডপাত আনন্দকে দেবেন না।
৩. বুদ্ধ আনন্দকে গন্ধকুটিরে থাকতে বলবেন না।
৪. আনন্দের গৃহীত নিমন্ত্রণে বুদ্ধ গমন করবেন ।
৫. আনন্দ যে-কোনো সময় আগন্তুক নিয়ে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।
৬. ধর্ম বিষয়ে জানার জন্য আনন্দ যেকোনো সময়ে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।
৭. আনন্দের অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত উপদেশসমূহ আনন্দকে পুনর্ব্যক্ত করবেন।

আনন্দ বুদ্ধের সেবকপদ গ্রহণ করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্যগুলো পালন করতেন। তিনি প্রতিদিন দুই প্রকার জল ও তিন প্রকার দন্তকাষ্ঠ বুদ্ধকে দিতেন। তিনি বুদ্ধের শরীর পরিষ্কার করে দিতেন। এ ছাড়া গন্ধকুটির পরিচ্ছন্ন, প্রদীপ প্রজ্জ্বালন ইত্যাদি কাজও করতেন। দিনের বেলায় গন্ধকুটিরে অবস্থান করে রাতে প্রদীপ হাতে নয়বার গন্ধকুটির প্রদক্ষিণ করতেন। কারণ, বুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি যেন উপস্থিত হতে পারেন। তিনি এভাবে বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সেবা করেছিলেন। বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরের ধীশক্তির প্রশংসা করে তাঁকে 'ধর্মভাণ্ডাগারিক' পদে অভিষিক্ত করেন। আনন্দ একাগ্রচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ শুনতেন এবং খুব মধুরভাবে সেসব উপদেশ বুঝিয়ে দিতে পারতেন। বুদ্ধ একসময় ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে বলেছিলেন, ভিক্ষুগণ! আনন্দের চারটি অদ্ভুত গুণ আছে। তা হলো: ১. আনন্দকে দর্শন করলে ভিক্ষুগণ তৃপ্তিবোধ করেন, ২. আনন্দ ধর্ম ভাষণ করলে ভিক্ষুগণ পরম তৃপ্তি লাভ করেন, ৩. আনন্দের সঙ্গে কথা বলে ভিক্ষুগণ পরিতৃপ্ত হন এবং ৪. ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাগণ আনন্দকে দেখে পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় আনন্দ স্থবিরের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে রোহিণী নদীর জল নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। বুদ্ধ বিবাদ মীমাংসার জন্য বৈশালী থেকে কপিলাবস্তু আসেন। বিবাদ মীমাংসা করে বুদ্ধ তাদেরকে কলহবিবাদ সূত্র দেশনা করেন। দেশনা শুনে পাঁচ শ শাক্যকুমার উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তাঁদের স্ত্রীগণ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করার প্রার্থনা জানান। কিন্তু বুদ্ধ তাঁদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে বৈশালীতে গমন করেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ পাঁচশ জন সহচারিণী হতাশ না হয়ে মস্তক মুণ্ডিত করে কাষায়বস্ত্র পরে করে খালি

পায়ে বৈশালীতে উপস্থিত হন। এখানেও বুদ্ধ নারীদের ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জানালে আনন্দ স্থবির ভগবান বুদ্ধকে তাঁর বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বিভিন্ন উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের দীক্ষা দেওয়ার অনুরোধ জানান। আনন্দের অনুরোধক্রমে বুদ্ধ মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ পাঁচশ শাক্য নারীকে উপসম্পদা করে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

বুদ্ধ শেষ জীবনে বৈশালীর চাপাল চৈত্যে অবস্থান করার সময় পাপমতি মারের অনুরোধে আয়ু সংস্কার বর্জন করেন। মাত্র তিন মাস পর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হবেন জানতে পেরে আনন্দ অত্যন্ত শোকাভিভূত হলেন। বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে বললেন, 'আনন্দ, তুমি শোক করবে না। আমি কি তোমাকে বলিনি যে, জগৎ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। সকলে প্রিয়বস্তু থেকে পৃথক হবে। সকল সংস্কার অনিত্য। তৃষ্ণা আর অবিদ্যার কারণে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। আনন্দ, তুমি মহাপুণ্যাত্মা, উদ্যম করো, মনোযোগ দিয়ে জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করো। তুমি অচিরে আসবক্ষয় করে অর্হত্ত্বলাভে সক্ষম হবে।'

বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পরে রাজগৃহে সপ্তপর্ণি গুহায় যে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি হয়, তাতে আনন্দ স্থবিরের অসাধারণ অবদান ছিল। সপ্তপর্ণি গুহায় ৫০০ জন অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে বুদ্ধবাণী সংগ্রহ করার জন্য এক মহাসম্মেলন বা সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। নির্বাচিত ভিক্ষুদের মধ্যে আনন্দ স্থবির ছাড়া সকলেই ছিলেন অর্হৎ। আনন্দ সঙ্গীতি অধিবেশনের আগের দিন সারা রাত ধ্যান-সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে অর্হত্ত্বফল লাভে সক্ষম হন।

যথাসময়ে সঙ্গীতির অধিবেশন শুরু হবার আগে নির্বাচিত ভিক্ষুগণ নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন। শুধু আনন্দের আসন শূন্য ছিল। অধিবেশন শুরুর পূর্বমুহূর্তে আনন্দ ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে তাঁর জন্য নির্ধারিত আসনে উপবেশন করলেন। এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে সব ভিক্ষু সাধুবাদ দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে সঙ্গীতির কার্যক্রম শুরু হয়। এই সঙ্গীতিতে উপালি স্থবির বিনয় এবং আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির সমগ্র সূত্র (অভিধর্মসহ) আবৃত্তি করেন। এভাবে আনন্দ স্থবির বুদ্ধবাণী সংরক্ষণে অবদান রেখেছিলেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫১

আনন্দ থেরর গুণের তালিকা তৈরি করো

** জায়গায় না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫২

তুমি আনন্দ থেরর যে যে মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করেছ, তার মধ্যে কোন গুণগুলো তুমি পালন করতে চাও এবং কীভাবে পালন করবে তা লেখো।

যে গুণগুলো পালন/চর্চা করতে চাই	কীভাবে পালন/চর্চা করব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৩

তুমি আনন্দ থেরর মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করেছ তার মধ্যে কোন গুণগুলো তুমি তোমার পরিবারে সদস্য/সহপাঠীদের পালন বা চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে তা লেখো।

যে গুণগুলো পালন/চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে চাই	কীভাবে পালন/চর্চায় উদ্বুদ্ধ করব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী

মহাপ্রজাপতি গৌতমী দেবদহে সুপ্রবুদ্ধের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতমের মাতা মহামায়ার ছোট বোন। মহামায়ার মৃত্যুর পর রাজা শুদ্ধোদন মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বিয়ে করেছিলেন। জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁদের সন্তানেরা রাজচক্রবর্তী রাজা হবেন। সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের সপ্তাহকাল পর তাঁর মাতা মহামায়ার মৃত্যু হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমীই সিদ্ধার্থের লালন-পালনের ভার নেন।

রাজা শুদ্ধোদন যথাকালে মৃত্যুবরণ করলে মহাপ্রজাপতি গৌতমী সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করার সংকল্প করেন। এ সময় কপিলাবস্তুতে পাঁচশত শাক্যকুমার বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁদের স্ত্রীরা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করার অনুমতি চান। কিন্তু বুদ্ধ তাঁদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে বৈশালীতে চলে যান। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও তাঁর সহচারিণী শাক্য নারীরা হতাশ না হয়ে মস্তক মুণ্ডন করে কাষায়বস্ত্র পরে হেঁটে বৈশালীতে পৌঁছেন। বুদ্ধ তখন বৈশালীর মহাবনের কূটাগার শালায় অবস্থান করতেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাঁর অনুগামী শাক্যনারীসহ ক্লান্ত ও শ্রান্ত দেহে মহাবনের কূটাগারে উপস্থিত হন। আনন্দ স্থবির বুদ্ধকে বললেন, প্রভু ভগবান, মহাপ্রজাপতি গৌতমী তোরণের বাইরে স্ফীত পদে, ধূলিধূসরিত অবস্থায় বিষণ্ন মনে এবং সজল চোখে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ নারীদের প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিন। আনন্দের প্রার্থনা পর পর তিনবার প্রত্যাখ্যাত হলে আনন্দ পুনর্বার বিনীতভাবে বললেন, বুদ্ধ, যদি নারীরা সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধের অনুশাসন মান্য করে ধ্যান সাধনায় রত হয়, তাহলে তারা কী আসবক্ষয় সাধন করতে সক্ষম হবে না? বুদ্ধ বললেন, সে শক্তি তাঁদেরও আছে। আনন্দ বললেন, তা যদি হয়, তাহলে প্রভু মহাপ্রজাপতি গৌতমী আপনার বিমাতা। আপনার মাতার মৃত্যুর পর তিনি মাতৃস্নেহে আপনাকে পরম আদরে লালন-পালন করেছেন। অতএব নারীদের সংসারধর্ম ত্যাগ করে তথাগতের নিয়ম ও অনুশাসন পালন পূর্বক ভিক্ষুণীধর্ম গ্রহণের অনুমতি দান করুন। বুদ্ধ নীতিগতভাবে আনন্দের আবেদন অনুমোদন করলেন। বললেন, নারীরা শাসনে প্রব্রজিত হতে হলে আটটি শর্ত আজীবন প্রতিপালন করতে হবে। এই শর্তগুলোকে অষ্ট গুরুধর্ম বলা হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ উপস্থিত শাক্য নারীরা সানন্দে অষ্টগুরু ধর্ম মেনে নিলেন। এরপর মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ পাঁচশত শাক্যনারীকে সঙ্ঘভুক্ত করা হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো ভিক্ষুণীসঙ্ঘ।

উপসম্পদা লাভের পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের কাছে গমন করে পূজা ও বন্দনা করলেন। বুদ্ধ তাঁকে ধর্মোপদেশ দিয়ে কর্মস্থান প্রদান করেন। তিনি অনতিবিলম্বে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তাঁর অপর সহচারিণীগণ জেতবনে বুদ্ধের কাছে নন্দকোবাদ সূত্র শ্রবণ করে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেন। বুদ্ধ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে থেরীদের মধ্যে প্রধান এবং জ্ঞানে-গুণে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী বৈশালীতে অবস্থানকালে বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে ১২০ বছর বয়সে পরিনির্বাণ লাভ করেন। কথিত আছে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় যেরকম অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, মহাপ্রজাপতি গৌতমীর পরিনির্বাণের সময়ও সেরকম সংঘটিত হয়েছিল। যেমন: সকলের প্রার্থনার পর শ্মশানে স্বয়ং অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ছিলেন ভিক্ষুণীসঙ্ঘের অভিভাবিকার মতো। সকল ভিক্ষুণীর প্রতি তাঁর সমান নজর ছিল। তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তাঁর সযত্ন দৃষ্টি থাকত। কোনো অসুবিধা হলে তা নিরসনে বুদ্ধের নির্দেশক্রমে ব্যবস্থা নিতেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী মনের আনন্দে অনেক প্রীতিগাথা ভাষণ করেছিলেন।

নিচে তাঁর ভাষিত কয়েকটি গাথার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

১. জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধবীরকে নমস্কার। তিনি আমার এবং বহুজনের দুঃখ মোচন করেছেন।

২. সকল দুঃখের কারণ আমার জ্ঞাত হয়েছে। অশুভের হেতু তৃষ্ণা আমার এখন দু রীভূত হয়েছে। আমি দুঃখনিবৃত্তির কারণ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে বিচরণ করছি।

৩. পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে আমি ইতিপূর্বে লক্ষ্যহীনভাবে মাতা, পিতা, পুত্র, ভাই, মাতামহীরূপে কতবার জন্ম গ্রহণ করেছি।

৪. তথাগতের দর্শনে আমি তৃষ্ণামুক্ত হয়েছি, এ দেহই আমার অন্তিম দেহ। জন্মান্তর রোধ হয়েছে। আমার আর পুনর্বার জন্ম হবে না।

৫. সব সময় শ্রাবক সঙ্ঘের দিকে লক্ষ্য রাখবে। তাঁরা দৃঢ় পরাক্রমশালী, ধ্যানপরায়ণ ও বীর্যবান। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিচরণশীল। তাঁদের পথ অনুসরণ করবে।

৬. কী আশ্চর্য! বহুজনের হিত ও কল্যাণার্থে মহামায়া সিদ্ধার্থকে প্রসব করেছিলেন। সত্যিই তিনি বহুগুণের অধিকারী। সেই গৌতম জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত থেকে সকল প্রাণীকে রক্ষা করেছেন এবং সকল দুঃখের বিনাশ সাধন করেছেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৪

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর গুণের তালিকা তৈরি করো

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৫

তুমি মহাপ্রজাপতি গৌতমীর যে যে মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করেছ, তার মধ্যে কোন গুণগুলো তুমি পালন করতে চাও এবং কীভাবে পালন করবে তা লেখো।

যে গুণগুলো পালন/চর্চা করতে চাই	কীভাবে পালন/চর্চা করব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৬

তুমি মহাপ্রজাপতি গৌতমীর মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করেছ, তার মধ্যে কোন গুণগুলো তুমি তোমার পরিবারে সদস্য/সহপাঠীদের পালন বা চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে তা লেখো।

যে গুণগুলো পালন/চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে চাই	কীভাবে পালন/চর্চায় উদ্বুদ্ধ করব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

মহা উপাসিকা বিশাখা

বুদ্ধের সময়ে অঙ্গদেশের ভদ্দিয় নগরে মেন্ডক নামে একজন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী ছিলেন। ধনঞ্জয় নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। ধনঞ্জয়ের স্ত্রীর নাম সুমনাদেবী। বিশাখা, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ও সুমনাদেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বিশাখার সাত বছর বয়সে ভগবান বুদ্ধ ১,২৫০ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ ভদ্দিয় নগরে আসেন। তখন মেন্ডক শ্রেষ্ঠী তাঁর নাতনি বিশাখা ও তাঁর পাঁচ শ সখীসহ বুদ্ধকে অভ্যর্থনা জানাতে যান। বুদ্ধ বিশাখার মানসিক অবস্থা অনুযায়ী ধর্মদেশনা করলেন। ধর্মদেশনা শুনে মেন্ডক শ্রেষ্ঠী, বিশাখা ও পাঁচশ সখী স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। বিশাখা সেদিন থেকে টানা আটমাস বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে খাদ্যভোজ্য দিয়ে সেবা করেছিলেন।

সে সময় শ্রাবস্তীতে মিগার নামের এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। পুণ্যবর্ধন নামে তাঁর এক বিবাহযোগ্য পুত্র ছিল। তাঁর জন্য সর্বগুণে গুণবতী বিশাখাকে স্ত্রী নির্বাচন করা হয় । বিশাখার বিবাহ উৎসব তাঁর পিতার বাড়িতে চার মাস ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় বিশাখার পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী তাঁকে দশটি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন। যেমন–

১. ঘরের আগুন বাইরে নিও না; অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির কারো দোষ দেখলে তা কখনো বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

২. বাইরের আগুন ঘরে আনবে না; অর্থাৎ প্রতিবেশী কেউ তোমার শ্বশুরবাড়ির কারো নিন্দা করলে তা শ্বশুরবাড়ির কারো নিকট প্রকাশ করো না।

৩. যে দেয় তাকে দেবে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কিছু ধার নিয়ে ফেরত দেয়, তাকে দেবে।

৪. যে দেয় না তাকে দেবে না; অর্থাৎ যে কোনো কিছু ধার নিয়ে ফেরত দেয় না, তাকে দেবে না;

৫. যে দেয় অথবা দেয় না তাকেও দেবে; অর্থাৎ কোনো দরিদ্র আত্মীয় ধার নিয়ে ফেরত দিতে না পারলেও তাকে ধার দেবে।

৬. সুখে উপবেশন করবে; অর্থাৎ এমন স্থানে উপবেশন করবে যাতে গুরুজন এলে উঠতে না হয়।

৭. সুখে আহার করবে; অর্থাৎ গুরুজনদের আহার শেষে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খবরাখবর নিয়ে আহার করবে।

৮. সুখে শয়ন করবে; অর্থাৎ যাবতীয় গৃহকাজ শেষ করে গুরুজনদের শয়নের পর নিজে শয়ন করবে।

৯. অগ্নি পরিচর্যা করবে; অর্থাৎ গুরুজনদের সেবা-শুশ্রূষা করবে।

১০. গৃহদেবতাকে নমস্কার করবে অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর-শাশুড়িসহ গুরুজনকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করবে।

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী পরদিন বিশাখাকে নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের মহালতা প্রসাধন হার, স্নানচূর্ণের ব্যয় নির্বাহের জন্য চুয়ান্ন শকটপূর্ণ অন্যান্য সামগ্রী, পাঁচশ দাসী, একশ অশ্বযান, বহু গাভিসহ গৃহকর্মের সামগ্রী দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠালেন। শ্বশুরবাড়িতে বিশাখা যাবতীয় কাজ নিজে করতেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হলেন।

বিশাখার শ্বশুর এবং পরিবারের সদস্যরা ছিলেন নিগ্রন্থ-সন্ন্যাসীদের অনুসারী। বিশাখার বিবাহ উৎসব মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে এক সপ্তাহ ধরে চলে। সপ্তম দিনে মিগার শ্রেষ্ঠী নিগ্রন্থ-সন্ন্যাসীদের আহ্বান করে পূজা সৎকারের আয়োজন করলেন। বিশাখাকে এসব সন্ন্যাসীকে পূজা বন্দনা করার জন্য বললে, তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বললেন, এসব উলঙ্গ সন্ন্যাসী কি কখনো অর্হৎ হতে পারে? ছিঃ ছিঃ! এরূপ বলে বিশাখা সে স্থান ত্যাগ করলেন। বিশাখার এরকম ব্যবহারে সন্ন্যাসীরা ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রেষ্ঠীকে বললেন, আপনার এই পুত্রবধূ শ্রমণ গৌতমের শিষ্য, তাঁকে অচিরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিন। তা না হলে আপনার মহাসর্বনাশ হবে।

একদিন এক অর্হৎ ভিক্ষু মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে ভিক্ষার জন্য বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু কেউ ভিক্ষা দিলেন না। বিশাখা বললেন, প্রভু, আমার শ্বশুর বাসি খাবার খাচ্ছেন; আপনি অন্যত্র ভিক্ষা করুন। বিশাখার কথায় মিগার শ্রেষ্ঠী ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন, বিশাখা, তুমি আমার কুলগুরুকে অপমান করেছ। বাসি খাবার খাই বলে আজ আমাকে অপমান করেছ; তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যাও।

বিশাখা বললেন, বাবা, আমি ক্রীতদাসী নই। ইচ্ছা করলে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমার পিতা আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আমার দোষাদোষের বিচার ও প্রতিকার করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের আহ্বান করে আমার দোষগুণ বিচার করুন। বিচারে আমি দোষী হলে আমি চলে যাব। এরপর আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আহ্বান করা হলো। তাঁরা এলে বিশাখা বললেন, আমার শ্বশুর বাসি খাবার খাচ্ছেন বলার অর্থ এই যে, তিনি পূর্বজন্মের পুণ্যফলের প্রভাবে এ জন্মে বিপুল ভোগসম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। তিনি এ জন্মে যা ভোগ করছেন তা পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল – এ অর্থে এ জন্মের ভোগসম্পদ সবই বাসি। মিগার শ্রেষ্ঠী জানতে চাইলেন বিশাখার পিতা যে রূপক অর্থে দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন, তার ব্যাখ্যা কী। বিশাখা সব কয়টির অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা প্রদান করলে মিগার শ্রেষ্ঠী নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তখন বিশাখা বললেন, এখন আমি পিতৃগৃহে চলে যেতে চাই। মিগার শ্রেষ্ঠী নিজের দোষ স্বীকার করে বিশাখাকে থাকতে অনুরোধ করেন। বিশাখা বললেন, আপনি উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের পূজারি, আমি অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ও সুসমাহিত ভিক্ষুসঙ্ঘের উপাসিকা। যদি আমাকে ইচ্ছামতো বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিতে ও সদ্ধর্ম শোনার সুযোগ দেন, তাহলে আমি থাকতে পারি। মিগার শ্রেষ্ঠী তাতে সম্মত হলেন।

বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাউপাসিকা বিশাখার খাদ্যভোজ্য দান

বিশাখা পরদিনের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধসহ ভিক্ষুসঙ্ঘ পরদিন মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে এসে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। খাদ্য ভোজ্যসহ দানীয় সামগ্রী সাজানো হলো। পরিবেশন করার জন্য মিগার শ্রেষ্ঠীকে আহ্বান করা হলো। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসীদের বাধার কারণে এলেন না। এরপর বিশাখা পরিপাটিরূপে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহার পরিবেশন করার পর শ্বশুরকে ধর্মবাণী শোনার জন্য আহ্বান করলেন। সন্ন্যাসীদের পরামর্শক্রমে বুদ্ধবাণী শোনার জন্য তিনি পর্দার আড়ালে বসলেন। বুদ্ধ বললেন, শ্রেষ্ঠী, তুমি পৃথিবীর যেখানেই থাকো না কেন, আমার উপদেশ শুনতে পাবে। এই বলে বুদ্ধ ধর্মদেশনা শুরু করলেন। বুদ্ধের ধর্ম শুনে শ্রেষ্ঠী শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন, তাঁর মিথ্যাদৃষ্টি দূর হলো। তারপর তিনি বুদ্ধের সামনেই পুত্রবধূ বিশাখাকে বললেন, মা, আজ থেকে আমি তোমাকে মাতৃস্থানে স্থাপন করলাম। তুমি আমাকে জ্ঞানচক্ষু দান করেছ। আজ থেকে তুমি আমার মায়ের মতো। সেই থেকে বিশাখা 'মিগার মাতা' নামে পরিচিত হলেন। মিগার শ্রেষ্ঠী বুদ্ধশাসনের উন্নতির জন্য ৪০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন। বিশাখা প্রতিদিন তিনবার ভোজ্যদ্রব্য ও পূজার উপকরণ নিয়ে বিহারে যেতেন। বুদ্ধের কাছে তিনি আটটি বর নিয়েছিলেন। সেগুলো হলো–

১. বুদ্ধের কাছে কোনো আগন্তুক ভিক্ষু এলে বিশাখাকে জানাবেন, বিশাখা তাঁর থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

২. বিশাখা আজীবন প্রতিদিন পাঁচশ ভিক্ষুর আহার দান করবেন।

৩. বিশাখা অসুস্থ ভিক্ষুর যাবতীয় চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করবেন।

৪. বিশাখা অসুস্থ ভিক্ষুর সেবক-সেবিকারও ভরণ-পোষণ করবেন।

৫. বিশাখা যে পাঁচশ ভিক্ষুর খাদ্যভোজ্য দান করবেন বুদ্ধও তা গ্রহণ করবেন।

৬. প্রতি বর্ষাবাসের সময় বিশাখা বুদ্ধ এবং পাঁচশ ভিক্ষুকে বর্ষাসাটিকাসহ অষ্টপরিষ্কার দান করবেন।

৭. বিহারের আবাসিক ভিক্ষুদের যত ওষুধ প্রয়োজন সব ওষুধ বিশাখা সরবরাহ করবেন।

৮. বিশাখা প্রতিবছর সকল ভিক্ষুকে 'কুণ্ডু প্রতিচ্ছাদন' নামক পরিধেয় বস্ত্র দান করবেন।

বিশাখা কোনো সময় বিহারে বুদ্ধদর্শনে গিয়ে ভুলবশত তাঁর মহালতা প্রসাধন হারটি বিহারে রেখে এসেছিলেন। পরে সেটি ফেরৎ পেলে বিশাখা এ হারের সমমূল্য পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে বিহার নির্মাণ করে দান দেওয়ার সংকল্পবদ্ধ হলেন। নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে বিশাখা বিহারের পূর্ব পাশে হাজার প্রকোষ্ঠযুক্ত পূর্বারাম বিহার ও গন্ধকুটি নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। বিশাখা প্রতিদিন ভিক্ষুদের জন্য খাদ্যভোজ্য নিয়ে সকালে একবার এবং ওষুধপথ্য ও অষ্টবিধ পানীয় নিয়ে বিকেলে একবার বিহারে গিয়ে ধর্ম শ্রবণ করতেন। বিশাখা ছিলেন পৃথিবীর নারী সমাজের আদর্শ। একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনে বিশাখার মতো সতীসাধ্বী নারীর জীবন-ইতিহাস পাঠ অপরিহার্য।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৭

বিশাখার গুণের তালিকা তৈরি করো

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

মানবিক গুণ

সততা

সত্যবাদিতা

মিষ্টভাষিতা

দানশীলতা

নেতৃত্ব

বন্ধুত্ব

ক্ষমাশীলতা

পরোপকার

মৈত্রীভাব

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৮

তুমি বিশাখার যে যে মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করেছ তার মধ্যে কোন গুণগুলো তুমি পালন করতে চাও এবং কীভাবে পালন করবে তা লেখো।

যে গুণগুলো পালন/চর্চা করতে চাই	কীভাবে পালন/চর্চা করব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৯

তুমি বিশাখার যে মানবীয় গুণের তালিকা তৈরি করেছ তার মধ্যে কোন গুণগুলো তুমি তোমার পরিবারে সদস্য/সহপাঠীদের পালন বা চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে তা লেখো।

যে গুণগুলো পালন/চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে চাই	কীভাবে পালন/চর্চায় উদ্বুদ্ধ করব

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬০

অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

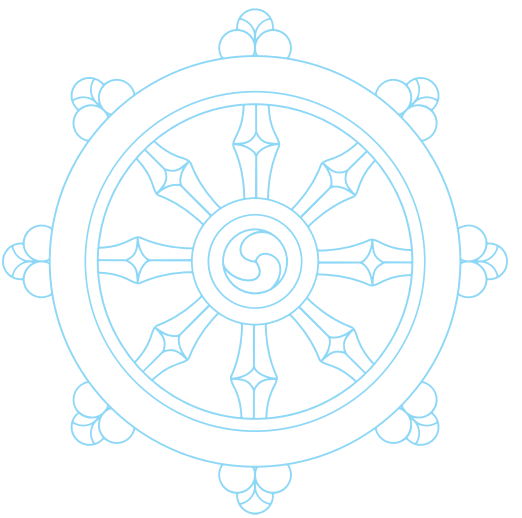

বৌদ্ধধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

এই অধ্যায় পাঠ করে আমরা ধারণা নিতে পারব–

১. পরমতসহিষ্ণুতা বলতে কী বোঝায়;

২. পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা;

৩. পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬১

শ্রেণিতে সবাই মিলে যেকোনো বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবাই তোমাদের নিজ নিজ মতামত চিরকুটে লিখে মতামত বাক্সে জমা দাও।

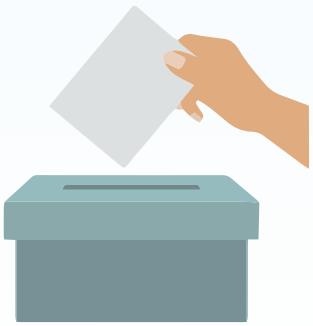

মতামত

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬২

বিভিন্ন মতামত থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিজ্ঞতাটি লেখো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

তোমরা ইতিমধ্যে গৌতমবুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জেনেছ। বুদ্ধ কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জন্য আবির্ভূত হননি। তিনি ছিলেন জগতের সব সত্তার জন্য শান্তি ও কল্যাণকামী মহামানব। তাঁর কোনো বাণীর আবেদনও কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি ছিলেন সর্বজনীন মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক। সব সত্তার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও দর্শনের মূল ভিত্তি। জগতের সবাই তাঁর আপন। তিনি সব সময় সব সত্তার কল্যাণেই নিবেদিতপ্রাণ। অপরের মত ও ধারণা তাঁর চিন্তার বিষয় নয়। অপরের মঙ্গল ও দুঃখমুক্তিই ছিল তাঁর ভাবনার বিষয়। তাঁর অন্তরে সব সময় বিরাজিত ছিল পরমতসহিষ্ণুতা।

পরমতসহিষ্ণুতা বলতে কী বোঝায়?

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে; প্রাচীন ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে। সে সময় জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য প্রথার প্রচলন ছিল। শ্রেণি বিভাজনের প্রকোপ ছিল সমাজ প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কিন্তু সে প্রাচীন কুসংস্কার গৌতমবুদ্ধকে স্পর্শ করেনি। তথাগত বুদ্ধ প্রচার করলেন মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই। জন্ম দিয়ে মানুষের শ্রেণি বিভাজন হয় না। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার কর্মে। তিনি মনে করতেন যেকোনো ব্যক্তি জন্মগত পরিচয়ে ভিন্ন মতাদর্শের হলেও মানুষ হিসেবে সবাই অখণ্ড মানব সমাজের উপাদান। সে অর্থে মানুষ পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোত্র ইত্যাদি ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার জন্য পরিচায়ক শব্দমাত্র। তথাগত বুদ্ধ সর্বজনীন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আত্মসচেতন হতে পরামর্শ দিয়েছেন। আত্মপ্রদীপ প্রজ্বালনের কথা বলেছেন; বিবেক জাগ্রত করার উপদেশ দিয়েছেন। যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চিনতে পারবে। নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে নিজের করণীয় বা আচরণ সম্পর্কে সচেতন হবে। একইসঙ্গে পারস্পরিক মূল্যবোধ ও সম্মানবোধ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে সবাই সচেষ্ট হবে। বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষা–এ আহ্বান নিয়েই বিকশিত হয়েছে। মানুষে মানুষে এই অকৃত্রিম আন্তরিক সম্পর্ক হলো পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার পরিচায়ক। এরকম আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সহায়তা ও সহানুভূতির বোধ সৃষ্টি হয়, সেটিই হলো পরমতসহিষ্ণুতা। পারস্পরিক প্রীতি সম্পর্ক সৃষ্টিতে এর চর্চার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই চর্চা হবে অসাম্প্রদায়িক এবং সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে, যা মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিকতাকে বিকশিত করবে। এর জন্য মানুষের সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি পরমতসহিষ্ণু হওয়াও একান্ত আবশ্যক। এই পরমতসহিষ্ণুতা হলো অপরের মতাদর্শ বা মতামতকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে বিবেচনা করা। পরমতসহিষ্ণুতা ছাড়া পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না; আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও সৃষ্টি হয় না। পরমতসহিষ্ণুতা ঐক্য ও সম্প্রীতির অনন্য উৎস।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬৩

অন্যেরা যখন মতামত দেয়, তখন আমাদের কী করা উচিত?

ক) কথা বলা;

খ) জোরে আওয়াজ করা;

গ) ধৈর্যসহকারে শোনা;

ঘ) নিজের খুশিমতো কাজ করা।

পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা

তথাগত বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষে প্রায় বাষট্টি প্রকার ধর্মমতের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন মুনি-ঋষির নিজস্ব সাধনা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই ধর্মমতগুলোর উদ্ভব। সেই ধর্মমত প্রবর্তনকারী অনেক মুনি-ঋষির সঙ্গে বুদ্ধের যোগাযোগ ছিল। তাঁদের মধ্যে জীবন ও জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাও হতো। এই আলোচনার লক্ষ্য ছিল পরস্পরকে বোঝা। অন্যের মতাদর্শকে উপলব্ধি করা। বুদ্ধ অপর কোনো ধর্মীয় মত ও পথকে কেন্দ্র করে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি বরং তাঁর নিজের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে বলেছেন, 'এসো, দেখো, উপলব্ধি করো, স্বীয় জ্ঞানে বিশ্লেষণ করো, প্রয়োজন মনে হলে গ্রহণ করো।' তিনি বলেছেন, কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রতি নিজেকে সমর্পণ নয়, আপন কর্মের মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে; প্রত্যেকের নিজ নিজ অন্তর চৈতন্যে জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত করতে। যার মাধ্যমে মানুষ কর্মে ও চিন্তায় সত্য, সুন্দর ও নিষ্ঠাবান হয়। অর্থাৎ, কে কোন ধর্মমতের অনুসারী সেটি বড় কথা নয়, নিজের চেতনা ও কর্মকে আদর্শবান ও নৈতিকতাসম্পন্ন করা একান্ত আবশ্যক। এভাবে তিনি সব মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সমন্বয় করতেন। সে কারণে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁর ধর্মাদর্শে স্থান পেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা ছাড়া সর্বজনীন সম্প্রীতি গড়ে ওঠে না। আবার এই বোধ ছাড়া পরিবার, সমাজ এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। তাই মানুষের জীবনে পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বলা যায় মানুষের জীবনে পরিবার ও সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজন অপরিসীম।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬৪

নিচের ছক দুটি পূরণ করো।

নিজের মত জোর করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিলে কী ঘটে?	অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিলে কী ঘটে?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

বুদ্ধ বলেছেন – মা জাতিং পুচ্ছি চরণঞ্চ পুচ্ছ, কট্ঠ হবো জাযতি জাতবেদো;

নীচাকুলীনোপি মুনী ধিতীমা, আজানিয হোতি হিরীনিসেধো।

অর্থাৎ, কারো জাতি-সম্প্রদায় পরিচয় জানার প্রয়োজন নেই, ব্যক্তির কর্ম ও আচরণ হলো অনুসন্ধানের বিষয়, কাঠ থেকে যেমন আগুনের উৎপত্তি হয়; তেমনি কেউ নীচকুলে জন্ম নিলেও বিবেক, সংযম ও নৈতিকতার মাধ্যমে উচ্চবংশীয় আচরণ বা নিজের আচরণ পরিশীলিত ও উন্নত করতে পারেন।

বুদ্ধ আরও বলেছেন – পরস্স চে ধম্মমনানুজানং, বালো'মকো হোতি নিহীনপঞ্ঞো;

সব্বেব বালা সনিহীন পঞ্ঞা, সব্বেবিমে দিট্ঠিপরিব্বসানা।

নিজ নিজ দৃষ্টির অনুগামী মানুষ কলহে নিযুক্ত হয়ে নিজেদের (জাহির করে) পন্ডিত হিসেবে ঘোষণা করে – এটি অনুচিত, যার এ জ্ঞান আছে, ধর্ম তাঁর জানা; যে এর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে পরিপূর্ণতাহীন। পরের ধর্ম স্বীকার না করা মানে জ্ঞানহীনতার পরিচয়, নিজ নিজ দৃষ্টির দাস।

বুদ্ধ বলেছেন – সকঞ্হি ধম্মং পরিপুণ্ণমাহু, অঞ্ঞস্স ধম্মং পন হীনমাহু;

এবম্পি বিগ্গয্হ বিবাদযন্তি, সকং সকং সম্মুতিমাহু সচ্চং।

নিজের ধর্ম সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ, অন্যের ধর্ম নিকৃষ্ট বা হীন, মানুষ এভাবে ভিন্নমত হয়ে বিবাদ করে, তারা নিজ নিজ মতকে সত্য বলে মনে করে। এভাবে নিজের ধর্মকে সত্য বলে দাবি করে অন্যদের হীন ভাবা অনুচিত।

সুতরাং, জগতের সব জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সম্মিলনে গঠিত হয় বৃহত্তর মানব জাতি। যেখানে জন্ম ও কোনো ধর্মীয় মতাদর্শ বিশ্বাসের জন্য আমরা পৃথক পরিচয় সৃষ্টি করি। এই পরিচয় মূলত মানবতাকেই খন্ডিত করে। তাই মানুষ হিসেবে সবার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার দায়িত্ব কর্তব্যবোধে আমাদের উজ্জীবিত হওয়া আবশ্যক। সবার ধর্ম বিশ্বাস থাকবে নিজের অন্তরে, আচরণ হবে সর্বজনীন কল্যাণ ও মঙ্গলমূলক। এর জন্য পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা অত্যাবশ্যক। পরমতসহিষ্ণুতা ছাড়া এরকম সর্বজনীন সর্বাঙ্গীণ কল্যাণময় লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব

পরমতসহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতাবোধ মানবজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর চর্চা ছাড়া পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কখনো সুন্দর মানবিক পরিবেশ গড়ে ওঠে না। তাই তথাগত বুদ্ধ সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক মৈত্রী ও সদ্ভাব বজায় রাখার উপদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে মানুষের মন উদার ও সংকীর্ণতাহীন হয়। আমাদের জীবনে এই পারস্পরিক সুসম্পর্ক বা সৌহার্দ্যবোধের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এই সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতাবোধের কারণেই মানুষের অন্তর থেকে শত্রুতা ও হিংসাভাব দূর হয়। মনে হিংসার পরিবর্তে সম্প্রীতিবোধ সৃষ্টি হয়। মানবিক মূল্যবোধে উদ্বোধিত মানুষের অন্তর্জগৎ। এ প্রজ্ঞার আলোয় একে অন্যের মত ও আদর্শকে বিবেচনা করবে। কর্ম ও পরিশীলিত আচরণেই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তথাগত বুদ্ধ কথা বলেছেন–

কম্মুনা বত্ততি লোকে, কম্মুনা বত্ততি পজা,
কম্ম নিবন্ধনা সত্তা, রথস্সাণীব যাযতো। (বাসেট্ঠ৬১)

কর্মের দ্বারা জগতের উৎপত্তি, কর্মের দ্বারাই মানব জন্মের সৃষ্টি; চলন্ত রথের চাকার মতো সত্ত্বগণ কর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।

সুতরাং এখানে জন্ম বা সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিচয় দিয়ে মানুষকে বিভাজন করা যায় না; এতে মূলত মানবতারই বিভাজন হয়, মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধের অখণ্ডতাই বিভাজিত হয়। পরমতসহিষ্ণুতা এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। সেজন্য পরমতসহিষ্ণুতার অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম। তথাগত বুদ্ধ আরোও বলেছেন–

ন পরো পরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি নং কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য। (করণীয় মৈত্রীসূত্র-৬)

অর্থাৎ, একে অপরকে বঞ্চনা করো না, কাউকে কিছুতেই কায়বাক্য দিয়ে ঘৃণা করো না, ক্রোধ ও হিংসার কারণে কাউকে অনিষ্ট করার ইচ্ছা করো না। এভাবে বুদ্ধ পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করে পরমতসহিষ্ণুতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুশীলন করার উপদেশ দিয়েছেন। আমাদের বর্তমান সামাজিক সংস্কৃতিতে পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করা অপরিহার্যভাবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে আন্তঃসামাজিক ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এটির অনুশীলনের অশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬৫

নিচের ছকটি পূরণ করো।

১ম দিন			
বাড়িতে সৌহার্দ্য ও পরমতসহিষ্ণুতা চর্চা			
কাজ	মতামত প্রকাশ	শোনা	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন			
কী রান্না করা হবে?			
ঘর কে গোছাবে?			

বিদ্যালয়ে সৌহার্দ্য ও পরমতসহিষ্ণুতা চর্চা			
কাজ	মতামত প্রকাশ	শোনা	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
শিক্ষাসফরে কোথায় যাব?			
মাঠে কোন খেলা খেলব?			

অন্যান্য স্থানে সৌহার্দ্য ও পরমতসহিষ্ণুতা চর্চা				
স্থানের নাম	কাজ	মতামত প্রকাশ	শোনা	সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সৌহার্দ্য ও পরমতসহিষ্ণুতা চর্চার দৈনিক কার্যক্রম ছক

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

সাত দিনের কার্যক্রম ছক পূরণ করে তোমার ডায়েরিতে লাগিয়ে শিক্ষককে দেখাবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬৬

সৌহার্দ্য ও পরমতসহিষ্ণুতা চর্চার ডায়েরি লেখার অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

শব্দকোষ

বুদ্ধের জীবন কথা

অঙ্গুরীয় — আংটি।

অশোকভান্ড — বিবাহযোগ্য রমণীরা উৎসবে এসে যে পাত্র থেকে উপহার গ্রহণ করে তা অশোকভান্ড।

ক্ষত্রিয় — বৈদিক সমাজের যে শ্রেণির মানুষ রাজ্যশাসন, রাজ্যরক্ষা এবং জনগণের নিরাপত্তা বিধান করতেন।

চার দিকপাল দেবতা — উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের রক্ষক দেবতা।

জঠর — পেট

নিমিত্ত — চিহ্ন, (শুভ বা অশুভ কিছুর) পূর্ব লক্ষণ; কারণ, প্রয়োজন।

মহা-অভিনিষ্ক্রমণ — কুমার সিদ্ধার্থের রাজপ্রাসাদ ত্যাগের ঘটনাকে একটি মহৎ ত্যাগ হিসেবে গণ্য করা হয়, বলেই এটিকে 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' বলা হয়।

মহিষী — প্রধান রানি।

মানস সরোবর — হিমালয়ের একটি সরোবর বা হ্রদ।

মোহ্যমান — দুঃখশোকে কাতর; মোহাচ্ছন্ন।

রাজচক্রবর্তী — সার্বভৌম নরপতি

সমাধি — বাহ্যজ্ঞানহীন ধ্যান, গভীর তন্ময়তা, চিত্তের একনিষ্ঠতা।

বিনয় পিটক

অনুপঞ্ঞত্তি — সম্পূরক নিয়ম-কানুন।

আপত্তি — অপরাধ। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা বিনয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গ করলে আপত্তি হয়।

উপসম্পদা — ভিক্ষুত্বে বরণ

প্রজ্ঞাপ্ত — জারি করা

বিনয় — ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের অবশ্যই পালনীয় আচরণ।

মার্গফল — মার্গফল চারটি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। যথা, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহৎ।

মূলাপঞ্ঞত্তি — মূল নিয়ম।

বন্দনা

পরিয়ত্তি — ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ত।

প্রতিবেদ — ধর্ম অনুশীলন।

বিমুক্তি — মুক্তি।

চংক্রমণ — পায়চারি।

কঠিন চীবর দান

অনুজ্ঞা — নির্দেশ বা আদেশ।

আনিশংস — পূণ্য।

উদকসীমা — উপসম্পদা প্রদানের স্থল যা সাধারণত পানি বেষ্টনির মাধ্যমে সীমা দেওয়া হয়।

কর্মবাচা — উপসম্পদা ও চীবর প্রদান এবং অন্যান্য ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার জন্য ত্রিপিটক থেকে সূত্র পাঠ করার নিয়ম।

ত্রিচীবর — ভিক্ষুর ব্যবহার্য বস্ত্র।

পাংশুকুলিক চীবর — জঞ্জাল ফেলার পাত্র হতে সংগৃহীত নেকড়া, ছেঁড়া ফালি দ্বারা প্রস্তুতকৃত চীবর।

ভিক্ষু সীমা — যেখানে উপসম্পদা দেওয়া হয়।

যোজন — দৈর্ঘ্যের পরিমাপ, যা প্রায় সাত মাইল।

জাতক, চরিতমালা ও উপাখ্যান

অধিষ্ঠান — সংকল্প, দৃঢ় সংকল্প।

উপেক্ষা — নিরপেক্ষতা, মন বা মেজাজের ধীরতা বা সমতা।

উপোসথ — অষ্টাঙ্গ শীল পালন।

কাষায় — গৈরিক বসন।

ক্ষান্তি — ক্ষমা বা সহিষ্ণুতা।

নৈষ্ক্রম্য — বন্ধন ত্যাগ, বন্ধনের কেন্দ্রস্থল গৃহ হতে বিদায়।

বোধিসত্ত্ব — যার মধ্যে বোধিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

জাতিভেদ — প্রাচীন ভারতের মানুষের শ্রেণিবিভাগ

সর্বজনীন — সবার জন্য প্রযোজ্য।

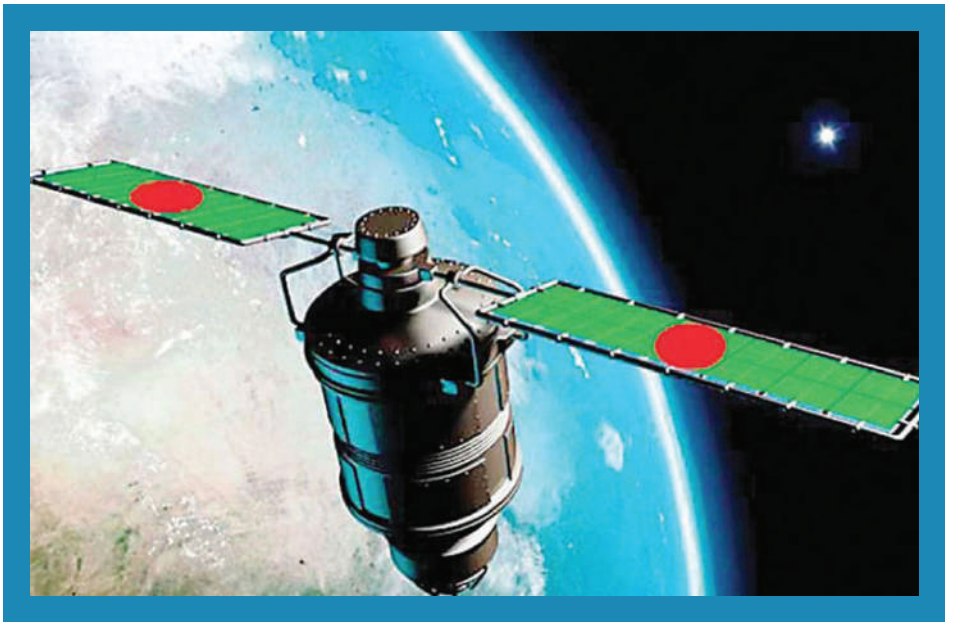

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ : বাংলাদেশের মালিকানাধীন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির (Geostationary) যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এর মধ্য দিয়ে ৫৭ তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। এটি ১১ই মে ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ছিল ফ্যালকন ৯ ব্লক-৫ রকেটের প্রথম পেলোড উৎক্ষেপণ।

এটি ফ্রান্সের থেলিস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক নকশা ও তৈরি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪০টি কে-ইউ এবং সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার বহন করছে এবং এর আয়ু ১৫ বছর। এর নির্মাণ ব্যয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ ও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ইন্টারনেট বঞ্চিত অঞ্চল যেমন- পার্বত্য ও হাওড় এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং সেবা, টেলিমেডিসিন ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রসারেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলো তাদের সম্প্রচার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে এর উপর নির্ভর করছে। ফলে দেশের টাকা দেশেই থাকছে। বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়লে এর মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় যোগাযোগ চালু রাখা সম্ভব। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ মহাকাশে উৎক্ষেপণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন, সেই স্বপ্ন মহীরূহে পরিণত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্যাটেলাইটের বাইরের অংশে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার রঙের নকশার উপর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু-১, বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও সেখানে রয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করো

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জীবসেবা পরম ধর্ম

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য